অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

অমূল্য গ্রন্থাবলী

নবযুগের নারী

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
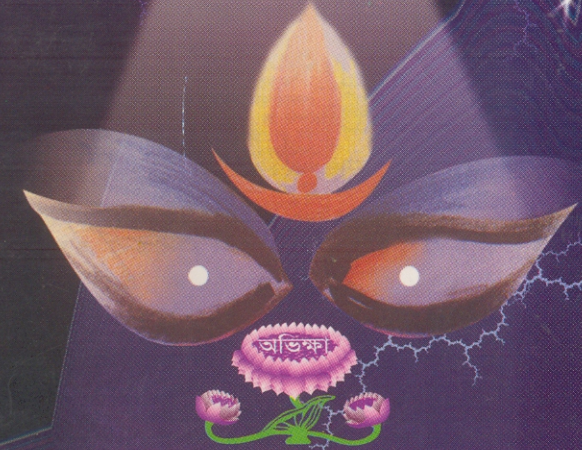
- নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ -
- ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ -

অযাচক আশ্রম
রহিমপুর,ডাকঃ-মুরাদনগর,জেলাঃ-কুমিল্লা

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)

প্রকাশক- **ডাঃ শ্রী যুগল ব্রহ্মচারী**
অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, মুরাদনগর,
কুমিল্লা-৩৫৪০
[2002]

পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থানঃ-

কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ঃ
অযাচক আশ্রম (বাংলাদেশ)
গ্রামঃ রহিমপুর, ডাকঃ মুরাদনগর,
জেলাঃ কুমিল্লা। পোষ্ট কোডঃ ৩৫৪০
ফোনঃ ০৮০২৬-৮০০৩
০৮১-৭৭৩১০, ৭৭৩২০ এক্স ৮০

জন্মস্থান কার্য্যালয়ঃ
অযাচক আশ্রম
পুরাতন আদালতপাড়া,
জেলাঃ চাঁদপুর-৩৬০০
ফোনঃ ০৮৪১-৫৮০৬

ডাকযোগে পুস্তক নিতে হইলে অগ্রিম মূল্যসহ একমাত্র অযাচক আশ্রম (রহিমপুর)এ ঠিকানায় পত্র দিবেন।

নিবেদন

পরমপূজ্যপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কতিপয় ভক্তিমতী কুমারী এবং যুবতীর নিকটে নারী-জীবনের আদর্শ, কর্ত্তব্য ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিয়া বিভিন্ন সময়ে বহু পত্র লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকখানা পত্র এখানে সন্নিবেশিত হইল। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণি কঠোর কর্ম্মময় অবিশ্রান্ত শ্রমপূর্ণ জীবনের স্বল্প অবসরে যখনি যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন, তখনি তাহাদের জীবনকে প্রেরণাপূর্ণ পত্রাবলির দ্বারা গঠনের চেষ্টা পাইয়াছেন। সেই সকল পত্র সঙ্কলন-পূর্ব্বকই তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। "নবযুগের নারী" গ্রন্থও তাহাই। গ্রন্থের জন্য গ্রন্থ রচনার অবসর শ্রীশ্রীবাবামণি কখনো পান নাই। তাঁহার রচিত সাহিত্য প্রধানতঃ এক একটা ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, সমষ্টিগত-সমাজ যে তাহা হইতে লাভবান হইতেছেন, ইহা উপরন্তু লাভ মাত্র।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত পত্রগুলি গ্রন্থে মুদ্রণ-কালে অধিকাংশস্থলেই তারিখ মুদ্রিত হয় নাই, কারণ তারিখ সংগ্রহ করা যায় নাই। একমাত্র "বিধবার জীবন-যজ্ঞ" গ্রন্থেরই তারিখগুলি সঠিক পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহা যথাযথভাবে মুদ্রিতও হইয়াছিল। "আপনার জন" বহিখানাতে কিছু কিছু তারিখ পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রগুলির তারিখ সংগ্রহ সম্ভব হওয়াতে তাহা মুদ্রিত হইল। এই পত্রগুলির কয়েকটা "মাতৃমন্দির" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণির রচিত "কুমারীর পবিত্রতা" কুমারী মাত্রেরই জীবনে পরম-পাবনী মহাশক্তির স্ফুরণ ঘটাইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণির রচিত "সধবার সংযম" বিবাহিত নারীদের জীবনে পুণ্য ও পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীহস্তনিঃসৃত এই "নবযুগের নারী" নারী-জীবনকে ব্যাপক মহিমা এবং গভীর সম্পদে সমন্বিত করিবে।

আমরা শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়া ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছি যে, বিপন্না নারীজাতির এমন অকপট বান্ধব জগতে আর কেহ নাই। যাঁহাদের সেবায় শ্রীশ্রীবাবামণি তিলে তিলে পলে পলে নিজের জীবনের অমূল্য পরমায়ু ব্যয়িত করিয়াছেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের মধ্যে আদৃত হইলেই আমরা কৃতার্থ বোধ করিব। ইতি- ৯ই পৌষ ১৩৬৪

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

পরমপূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের পবিত্র লেখনী-প্রসূত "নবযুগের নারী" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৩৭৭ এবং তৃতীয় সংস্করণ পৌষ ১৩৮৪তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দেশের হাওয়া দিনের পর দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কাল যে আদর্শ সমাদৃত ছিল, আজ তাহা সেকেলে কুসংস্কারে পর্য্যবসিত হইতেছে। সমাজের প্রতি স্তরে এইরূপে পরিবর্ত্তন চালু হইয়া থাকিলেও, যাহা শাশ্বত সত্য, তাহার বিলোপ কখনো হইবার নহে। "নবযুগের নারী" এক শাশ্বত সত্যের বাণী বহন করিয়া চলিতেছে। সুতরাং ইহার সমাদর অবশ্যম্ভাবী। ইতি- আশ্বিন, ১৩৯১।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

বাংলাদেশ প্রথম সংস্কারণের নিবেদন

জগত সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীসমাজ ক্রমান্বয়ে অধিকার-সচেতন হচ্ছেন। অধিকার সচেতনতা তখনই সার্থক যখন তা' সমাজের জন্য যে গৌরবাস্পদ। সনাতনী মনীষীগণ নারীর যত রূপ তার মধ্যে মাতৃরূপকেই শ্রেষ্ঠ পরিগণনা করেছিলেন। মাতৃরূপে ভগবদারাধনা – নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশেরই বহিঃপ্রকাশ।

আধুনিক জগতে জাতি গঠনে নারী সমাজের অবদান অপরিসীম। নেপোলিয়ান বলেছিলেন– "The future destiny of the child is always the work of the mothers". [সন্তানের ভবিষ্যৎ মায়ের শ্রমের উপর নির্ভরশীল]। একটি উন্নত জাতির আত্মপ্রকাশ কেবল উন্নত চরিত্র মায়েদের দ্বারাই সম্ভব।

মহর্ষি অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব, আদর্শ নারী হিসেবে জীবন গঠনের যুগোপযোগী প্রেরণা প্রদান করেছেন, যা নবযুগের নারী সমাজকে কেবল অধিকার সচেতনই করবে না বরং যার অনুসরণ–অনুশীলন নারী মাত্রকেই করবে শ্রেষ্ঠ গৌরবে গৌরবান্বিত। এ মহর্ষির মাতৃজাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপদেশাবলী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে "কুমারীর পবিত্রতা" (ছয়টি খণ্ডে), "নবযুগের নারী", "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য", "বিবাহিতের জীবন সাধনা", "সধবার সংযম", "বিধবার জীবন যজ্ঞ"–প্রমুখ গ্রন্থাবলী যা প্রতিনিয়ত প্রদান করবে আদর্শ নারী জীবন গঠনের দিব্য প্রেরণা।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির অপার অনুগ্রহে 'নবযুগের নারী' গ্রন্থের বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এ উদ্যোগ মাতৃজাতির সেবায় ও কল্যাণে লাগুক এই বিনীত কামনা।

ইতি- ৬ই মাঘ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ (আগমনী উৎসব)

অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, মুরাদনগর
কুমিল্লা।

বিনীত নিবেদক-
ডাঃ যুগল ব্রহ্মচারী
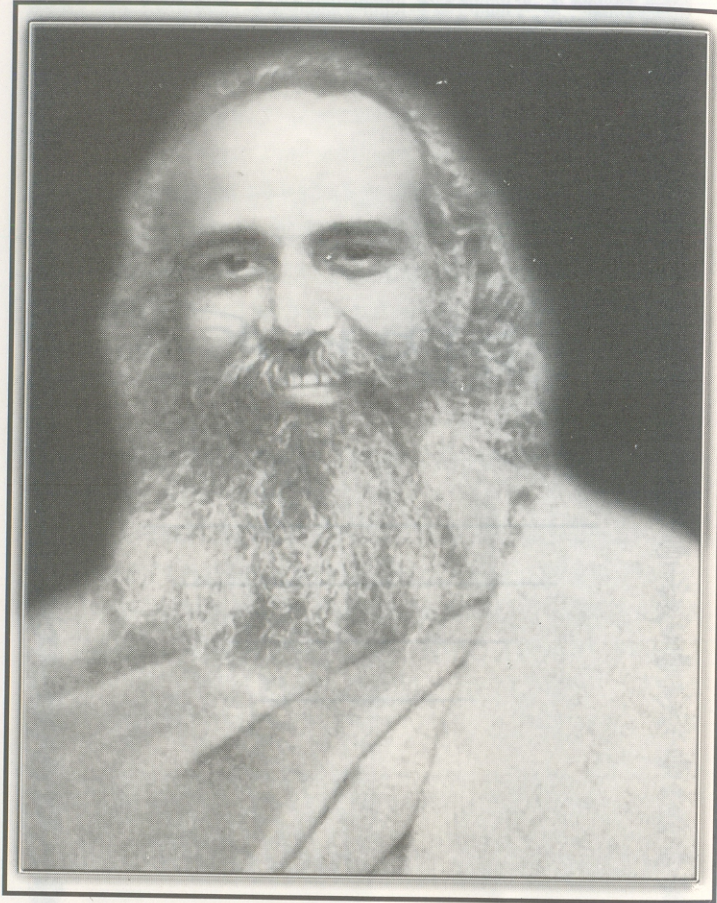
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

নবযুগের নারী

প্রথম পত্র

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৪

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

মা, ★★★ আজ তুমি সংসারের শত গুরুতর পেষণে পিষ্ট হইয়া নিজেকে একটা সামান্যা নারী বলিয়া মনে করিতে পার, কিন্তু তোমারই ভিতরে এক অসামান্যা মহামানবী ঘুমাইয়া রহিয়াছে। সেই মহামানবী যেদিন জাগিবে মা, তোমার ক্ষীণ কণ্ঠ বজ্র-গর্জ্জনকেও তুচ্ছ করিয়া ভৈরব-নিনাদে হুঙ্কার করিয়া উঠিবে। সেদিন তোমার দৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পাপ, সকল তাপ, সকল নীচতা ও সকল জঘন্যতাকে রুদ্রাগ্নিতে দগ্ধ করিবে। সেদিন তোমার দুর্ব্বল বাহু কটাক্ষের মধ্যে সকল মিথ্যাকে ছিন্নশির করিয়া দিবে।

আজ তোমরা ঘুমাইয়া রহিয়াছ। তাই না আজ তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী নিদ্রার ঘোরে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। তাই না আজ তাহারা গৌরবদীপ্ত অতীত আর পৌরুষদীপ্ত ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়া ঘোরতর তামসিকতার ভজনা করিতেছে। তাই না আজ গৃহে গৃহে মিথ্যার অর্চ্চনা আর অমঙ্গলের আরতি! তাই না আজ হৃদয়ে হৃদয়ে পাপের বন্যা প্রবাহিত আর পশুত্বের হিল্লোল সমীরিত! তাই না আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির, জিহ্বা থাকিতেও বোবা, বুদ্ধি থাকিতেও বোকা, শক্তি থাকিতেও দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ।

আজ তোমাদিগকে জাগিতে হইবে এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টির অমোঘ স্পর্শে মৃতপ্রায় সন্তানের দলকে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ক্ষমতা দিতে হইবে।

তোমরাই আজ ভারতবর্ষের নবযুগের প্রসবিত্রী, তোমরাই আজ আমাদের পুনর্জ্জন্মের জগদ্ধাত্রী। তোমাদিগকে আজ শিক্ষার বলে, সাধনার বলে, সত্যের বলে এবং সাহসের বলে জননীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে শিক্ষা দুর্ব্বল মেরুদণ্ডকে সবল করে, সেই শিক্ষা, যে সাধনা মায়ার জগতে সত্যের প্রতিষ্ঠা করে, সেই সাধনা, যে সত্য দেশ-কাল-পাত্রের শত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াও নিজের পূর্ণতা ও পবিত্রতা রক্ষা করে, সেই সত্য এবং যে সাহস আঁখির পলকে জাতীয় ইতিহাসের কলঙ্করাশিকে সমূলে ধ্বংসসাৎ করে, সেই সাহস সন্তানের জাতির মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিতে হইবে।

মা, আজ হইতে তাহারই জন্য প্রস্তুত হও, বুকে সাহস বাঁধিয়া, হৃদয়ে ভক্তি লইয়া, প্রাণে বিশ্বাস রাখিয়া, আজ হইতে তাহারই জন্য আত্মগঠন আরম্ভ কর। ★ ★ ★ ইতি -

শুভাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২)

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩৪

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

স্নেহের মা, ★ ★ ★ নারীজাতির মহিমাকে আশ্রয় করিয়া আমার মন যতগুলি উন্নত চিন্তা করিয়াছে, তাহার সবগুলিই আমি ধীরে ধীরে তোমার নিকটে পরিবেশন করিব। একটার পরে একটা কথা তুমি নিজের অন্তরের সহিত মিলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেই আমার যথার্থ উদ্দেশ্য সফল হইবে।

ভারতবর্ষের মহিমান্বিতা নারী-জাতি অধঃপতনের অবসন্নতায় ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গের দিব্য জ্যোতি মিথ্যাচার, অনাচার ও কদাচারের ধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষের দীপ্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহার বুকের আশা বিষাদে ডুবিয়া গিয়াছে। এই অবনতিদশাগ্রস্তা রমণী-সমাজের উন্নতি বিধান আমার স্বপ্নময় জীবনের এক অত্যাশ্চর্য্য প্রার্থনা।

তাই, আমি নারীর কণ্ঠে বজ্রধ্বনি শুনিলে তাঁহাকে পূজা করি। তাই, আমি নারীর বাহুতে শক্তির বিকাশ দেখিলে "জয়মা রণচণ্ডী" বলিয়া তাঁহার বিজয় ঘোষণা করি। তাই, আমি নারীর চক্ষে অভয়দৃষ্টি দেখিলে তাঁহার পদতলে অর্চ্চনার কুসুমাঞ্জলি বর্ষণ করি।

সেদিন একটী মহীয়সী মহিলার বীরত্ব শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ছলনাকারী দুর্ব্বৃত্ত তাঁহার পবিত্রতা নষ্ট করিতে আসিয়াছিল, শ্মশান-কালীর কন্যা মা আমার সেদিন সেই নরপশুর বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া পাশবিকতার উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছিলেন। অবলার দুর্ব্বল বাহুমূলে সেদিন শক্তির অভাব হয় নাই, রমণীর কোমল হৃদয়ে সেদিন সাহসের অপ্রতুলতা ঘটে নাই। এই যে শক্তি এবং সাহসের পূর্ণতা, এই যে মনুষ্যত্বের সম্মান-রক্ষাকল্পে অমানুষিক আবেগ, আমার পূজার পুষ্পপত্র তাহারি চরণ-প্রান্তে সমর্পিত।

আর একদিন পশ্চিম হইতে গাড়িতে আসিবার সময় এক ভদ্রমহিলা মদিরা-চঞ্চল কয়েকটা গোরা সৈন্যকে চাবুক মারিয়া মেয়েদের গাড়ি হইতে নামাইয়া দিয়াছিলেন। খোলা ষ্টেশানটার উপরে যখন গোরা কয়টা মেয়েদের গাড়ীতে গিয়া অশ্লীল ও কুৎসিত কথা কহিতে কহিতে উঠিল, তখন সেখানে পুরুষ-দর্শকের অভাব ছিল না, নিজের জাতীয় নিজের দেশের মেয়েদের লাঞ্ছনা চক্ষের সম্মুখে দেখিবার জন্য কাপুরুষ-দলের অপ্রতুলতা ছিল না। ভদ্রমহিলারা সকলে মিলিয়া হাউমাউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, কিন্তু কামোন্মত্ত শয়তান কয়টার গতি রোধ করিবার জন্য কেহ আসিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল না, ষ্টেশন মাষ্টার কোন প্রতিবিধান করিলেন না, রেলপুলিশ একবার তাকাইয়াও দেখিল না, এমন একটা ঘটনা তাহাদের নজরেই পড়িল না। গার্ড বংশীধ্বনি করিলেন, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, তিন চারিটা বলবান গোরা-সৈনিকের যথেচ্ছাচারের সম্মুখে পড়িয়া অবলা নারীকুলের যে কি অবস্থা হইল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু সহসা ট্রেণ থামিয়া গেল। দেখা গেল, গোরা কয়টা রক্তাক্ত-কলেবরে গাড়ি হইতে নামিয়া যাইতেছে আর একটী মধ্য-বয়সিনী ক্ষীণাঙ্গী নারী সবলে তাহাদের মাথায় ছড়ি চালাইতেছেন।

এই যে সাহসিকতা, আমি ইহার পূজা করি।

ভারতবর্ষের রমণীসমাজের মধ্যে এই সাহসিকতার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য আজ মা তোমাদের মতন নিষ্পাপ-দেহা নিষ্পাপচিত্তা শুদ্ধসংস্কার-আত্মশ্রদ্ধাপরায়ণা কন্যাদের আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। পুত্রগণ যখন দেশ-জননীর প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া থাকে, তাহারা যখন নিজেদের অতীত এবং ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি দিতে পরাঙ্মুখ হইয়া শুধু আত্মসুখেরই সেবা করে, তখন জননীর দুঃখ দূর করিবার জন্য, জননীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তোমাদেরই ন্যায় পুণ্যচরিতা পূতস্বভাবা কন্যাদের জীবনাহুতি দানের প্রয়োজন পড়ে। তোমাদিগকে আজ বুঝিতে হইবে, ভারতমাতার কন্যা হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবার দায়িত্ব কত বড় বিরাট, কত বড় বিশাল। তোমাদিগকে আজ উপলব্ধি করিতে হইবে, যে দেশের পুরুষের দল নিজেদের সমগ্র শক্তিতে শুধু ক্ষণস্থায়ী সুখের ও ক্ষণভঙ্গুর আমোদের অনুসরণে ব্যয়িত করিয়া দিতেছে, সেই দেশের মায়ের জাতি, ভগ্নীর জাতি, কন্যার জাতি হইয়া জন্মলাভ করিবার দায়িত্ব কত বিপুল, কত ব্যাপক। আজ বুঝিতে হইবে, আজ জানিতে হইবে, তোমাদের স্নেহের দৃষ্টিতে, তোমাদের কল্যাণ-কামনায়, তোমাদের মঙ্গল-আশিসে ভবিষ্যৎ পুরুষ-সমাজের কতখানি অভ্যুদয় কিভাবে নিহিত রহিয়াছে।

তোমরা শক্তি-স্বরূপিণী। যে আদিভূতা পরমানন্দময়ী ব্রহ্মশক্তি হইতে জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তোমরা আর সেই মহাশক্তি এক এবং অভেদ। বিশ্বসৃষ্টির আদিতেও যাঁহার লীলা অনাদি, সৃষ্টির বিকাশের মধ্যে একমাত্র যাঁহার বিকাশ, প্রলয়ে সব কিছু যাঁহাতে বিলীন হইবে, সেই অখণ্ড অনন্ত পূর্ণানন্দময়ী পরমাশক্তিতে এবং তোমাতে কোনও পার্থক্য নাই। দেব-মানব, যক্ষ-রক্ষ, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষ-লতা এবং অণু-পরমাণুরও যিনি আদি কারণ, এমন কি দেবতাগণ এবং সিদ্ধ মহাপুরুষগণ প্রত্যেকে একমাত্র যাঁহারই অদ্বিতীয় শক্তিতে শক্তিমান্, সেই অঘটন-ঘটন-সমর্থা মহাশক্তিতে এবং তোমাতে কোনও ভেদ নাই। যে মহাশক্তি কখনও প্রত্যক্ষে থাকিয়া, কখনও পরোক্ষে রহিয়া আশ্চর্য্য লীলা সাধন করিতেছেন, তোমরা প্রত্যেক নারী তাঁহারই প্রস্ফুট বিকাশ মাত্র। বলিতে কি, কখনও কোনও নারীর পদপ্রান্তে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, আমার মনে হয় কোটি জন্মের

দুষ্কৃতি যেন এক নিমেষের মাতৃ-চিন্তায় বিদূরিত হইল। কখনও নারীর মুখমণ্ডলের প্রতি যখন তাকাই, তখন মনে হয়, জগন্মাতার সহাস্য সুন্দর আস্যের অপূর্ব্ব পবিত্রতাদীপ্ত স্নেহ-সৌভাগ্য যেন জ্যোৎস্নার মত সমগ্র জগতের বুকে ছড়াইয়া পড়িল। অনেক মহাত্মা নারীজাতির নানা ভাবে নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রত্যয়ে দৃঢ় হইয়া এই একটী সত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে যে, এ জাতির সৃষ্টি না হইলে আমরা 'মা' কথা কহিবার সুযোগ পাইতাম না; দেশকে বা ভগবানকে মা বলিয়া জানিবার, মা বলিয়া বুঝিবার অধিকারী হইতাম না। মা কথা অমৃতময়ী, মাতৃ-চিন্তা অমৃতময়ী, মাতৃ-দর্শন মৃত্যু-নিবারক, মাতৃ-স্নেহ-লাভ মৃতু-সঞ্জীবনী-সাধক। এই মাতৃ-সাধনার প্রতীক তোমরা।

তাই, ভারতবর্ষের তথা জগতের ভবিষ্যৎ-অভ্যুত্থানের সহিত তোমাদের সম্বন্ধটা এত নিবিড়, এত গভীর, এত ঘনিষ্ঠ। তোমাদের চরণপদ্মের স্পর্শ পাইয়া মরুভূমিতে বিশ্বদেবতার পূজার জন্য প্রেমের স্থলকমল আত্মোৎসর্গের সুমধুর হাসি হাসিয়া ফুটিয়া উঠিবে। তোমাদের আশিস-মাখান স্নেহস্নিগ্ধ কল্যাণ-দৃষ্টির প্রভাব পাইয়া অজ্ঞাতবীর্য্য আত্ম-অবিশ্বাসীও তেজে, বলে, পৌরুষে ত্রিলোক স্তম্ভিত করিবে। মাতা হইয়া কোনও নারী সন্তানকে হাসি-মুখে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিবে, পত্নী হইয়া কোনও নারী স্বামীকে আত্মাহুতির মহাযজ্ঞে উৎসাহিত করিবে, ভগ্নী হইয়া কোনও নারী ভ্রাতার বুকে বজ্রের বল সঞ্চারিত করিয়া দিবে, কন্যা হইয়া কোনও নারী পিতার নীচতা, পিতার হীনতা, পিতার অমানুষত্ব নিমেষে দূরীভূত করিবে। তোমাদের মধ্যে যে সর্ব্ববিজয়িনী অব্যর্থ শক্তি রহিয়াছে, তাহারই কটাক্ষের ইঙ্গিতে সমগ্র জগৎ তাহার তামসিকতা পরিহার করিয়া পবিত্রতার জাহ্নবী সলিলে স্নাত ও শুদ্ধতার চন্দনপ্রলেপে স্নিগ্ধ হইবে।

হে মা, আজ তোমরা জাগো, আজ তোমরা ওঠ, আজ তোমরা সন্তানের জাতির বুকে নিজেদের আত্মবিসর্জ্জনের মহিমায় পূর্ণ মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমাদের যাহারা সন্তান, তাহাদের ভীরুত্ব, কাপুরুষত্ব, ক্লীবত্ব দূরীভূত কর। তোমাদের যাহারা সন্তান, তাহাদের আলস্য, কর্ম্মকুণ্ঠা ও অবসাদের কলঙ্ক নিজেদের হস্তে মোচন কর; সন্তানের জাতির অন্ধত্ব,

অদূরদর্শিতা ও অনিত্যপ্রীতি ঘুচাইয়া দাও।

সঙ্ঘবদ্ধ হইলে নারীজাতি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে; কিন্তু একটী নারীও কম পারে না। একটী নারীর মধ্যে ভবিষ্যতের পাঁচটী পরিবার ঘুমাইয়া রহিয়াছে, পাঁচটী গোষ্ঠীর অফুরন্ত ধারা একটী নারীকে উৎস করিয়া রহিয়াছে। সন্তান-প্রসবিত্রী জননী-রূপে নারী প্রত্যেকটী সন্তানের বংশধারার মধ্যে মঙ্গলের বীজ বপন করিতে পারেন। যিনি নিঃসন্তানা সধবা, তিনি নিজ স্বামীর প্রাণে সমাজ-কল্যাণের জ্বলন্ত শিখা নিয়ত উদ্দীপিত করিয়া নিজের কল্যাণময়ী সদিচ্ছাকে সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারেন। যিনি চির-কুমারী বা নিঃসন্তানা বিধবা, তিনি নিজের প্রত্যেকটী শ্বাস ও প্রশ্বাস এবং নিজের প্রত্যেকটী চিন্তা ও চেষ্টা সমগ্র নারীজাতির উন্নতি-সম্পাদনে ব্যয় করিতে পারেন। সমকক্ষ-শক্তি-সম্পন্না, সমরূপ-রুচি-সম্পন্না, সমবিধ-সংস্কার-সম্পন্না নারী-কর্ম্মীরা যদি একই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সমবেত হন, তবে সেই সম্মিলিত শক্তি না করিতে পারে, এমন কার্য্য নাই। কিন্তু যাহার কোন সঙ্গিনী নাই, কোনও সহায়তাকারিণী নাই, কোনও বান্ধবী নাই, সেই কর্ম্মিণীও যদি নিজের ব্রহ্মত্ব স্মরণে রাখিয়া অগ্রসর হন, তবে সব করিতে পারেন।

এইজন্য সর্ব্বপ্রথমে আজ তোমাকে আমি তোমার ব্রহ্মত্ব স্মরণ করাইতে চাহিতেছি। কেননা, নিজ ব্রহ্মত্ব স্মরণেরই নাম জাগরণ, ইহার বিস্মৃতিরই নাম নিদ্রা। স্মরণ কর মা, দেহের মৃত্যুতে যাঁহার মৃত্যু হয় না, দেহের জন্মে যাঁহার জন্ম হয় না, দেহের ক্ষয়ে যাঁহার ক্ষয় হয় না, দেহের বৃদ্ধিতে যাঁহার বৃদ্ধি হয় না, সেই নিত্যপ্রাণ, জরামরণাতীত, ক্ষয়োদয়-রহিত পরব্রহ্মই তুমি। স্মরণ কর মা, অস্ত্রের দ্বারা যাঁহাকে ছেদন করা যায় না, অগ্নির দ্বারা যাঁহাকে দগ্ধ করা যায় না, জল যাঁহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু যাঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, যাঁহার অন্ত নাই, সীমা নাই, আরম্ভ নাই, শেষ নাই, অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, সেই পরমাশ্চর্য্য পরব্রহ্মই তুমি। স্মরণ কর মা, তুমিই বিকশিত হইয়া জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের রূপ ধরিয়াছ, তুমিই নদ-নদী-পর্ব্বত ও সাগর হইয়াছ, তুমিই পশুপক্ষী, তরুলতা, সরীসৃপ ও মানুষ হইয়াছ, তুমিই বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও প্রৌঢ় হইয়াছ। তুমিই স্ত্রীজাতি

ও পুরুষজাতি হইয়াছ। স্মরণ কর মা, সমুদ্রের মধ্যে যেমন নদীর জল প্রবেশ করে এবং নিজস্বতা হারাইয়া সমুদ্রই হইয়া যায়, তোমার মধ্যে তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করিবে এবং সকল নিজস্বতা বিসর্জ্জন দিয়া তোমাতেই পরিণত হইবে। তুমিই সৃষ্টির মূল, স্থিতির মূল, সংহারের মূল,— তুমিই আত্মশক্তি।

এই স্মৃতিই তোমার আত্মস্মৃতি। এই ব্রহ্মস্মৃতিতে নিয়ত চৈতন্যই তোমার আত্মচৈতন্য। তোমার এই আত্মস্মৃতি ও আত্মচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াই ভারতবর্ষের অধঃপতিত মনুষ্যত্ব গৌরব-মোহন প্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ★ ★ ★ ইতি- শুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ

(৩)

পুপুনকী আশ্রম

১৪ই চৈত্র, ১৩৩৪

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

স্নেহের মা, ★ ★ ★ নারীজাতির অভ্যুদয়কে আমি বড় আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করি। কেন করি? যেহেতু এই জাতির জঠরে আমরা দশ মাস দশদিন বাস করিয়া তবে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, যেহেতু এই জাতির বুকের স্তন্য আমার দেহ, মন ও মস্তিষ্ককে পুষ্ট ও বিকশিত করিয়াছে। তোমরাই তোমাদের অমৃতময়ী স্নেহ-দৃষ্টি দিয়া আমাদের জীবনকে চিরস্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। এইজন্যই আমি ভারতবর্ষের অভ্যুদয়কে তোমাদের উন্নতি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে, বুঝিতে বা ভাবিতে পারি না। তোমাদের চক্ষে ভগবান্ স্বভাবতঃ যে স্নেহ-দৃষ্টি দিয়াছেন, তাহাতে প্রজ্ঞার দৃষ্টি না ফুটিলে, এইজন্যই আমার প্রাণে শান্তি আসিবার নহে।

কিন্তু শুধু শিক্ষাই প্রজ্ঞার দৃষ্টিকে উন্মোচিত করে না। প্রজ্ঞার দৃষ্টি খোলে সাধনের শক্তিতে। সুশিক্ষা সাধনের শক্তি বিকাশের আনুকূল্য করে এবং শিক্ষার সহিত সাধনের দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া দেয়। অশিক্ষিতা নারী সাধনের শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পরমকল্যাণকে লাভ করিয়াছেন বটে এবং বিদ্যার্জ্জনরতা নারী সাধনের সংস্পর্শ বর্জ্জন করিয়াও সুশিক্ষিতা হইয়াছেন বটে, কিন্তু যে

নারীর মানসী প্রতিমাকে দশভুজশালিনী-রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আমি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের প্রসবিত্রীকে পূজা করিতেছি, সেই মহীয়সী নারীর জীবনে শিক্ষা ও সাধনের সমন্বয় চাই, সামঞ্জস্য চাই, সমভাবে উন্মেষ চাই।

তাই, তোমাদের কাহাকেও শিক্ষার্জ্জননিরতা দেখিলেও ষোল আনা খুশী হই না। আবার কাহাকেও নিয়ত সাধনশীলা দেখিলেও পূর্ণ আনন্দটুকু পাই না। যিনি শিক্ষানিরতা, তিনি যদি নিজ মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধনের দিকেও তীক্ষ্ণ, তীব্র ও একাগ্র দৃষ্টি দান করেন, তবেই প্রাণটা হরষে ভরিয়া উঠে। যিনি সাধননিরতা, তিনি যদি জীবনটাকে শিক্ষার বিভায় দীপ্ত করিতেও চেষ্টা করেন, তবে আর আমার আনন্দের সীমা থাকে না।

আমি শিক্ষার পক্ষপাতী, কেন না, শিক্ষা নিজের বিকশিত শক্তির প্রয়োগে নৈপুণ্য দান করে। আমি সাধনের পক্ষপাতী, কেননা, সাধন অবিকশিত শক্তি-সমূহকে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত করে।

তুমি বর্ত্তমান বাঙ্গলার কন্যা কিন্তু ভবিষ্যৎ বাঙ্গলার জননী। তোমার সকল মহত্ত্ব, সকল কৌলীন্য তুমি বর্ত্তমান বাঙ্গলার কাছ হইতে পাইয়াছ। কিন্তু ভবিষ্যৎ বাঙ্গলা তাহার সকল মহিমা ও গরিমা তোমার কাছ হইতে পাইবে। বর্ত্তমান বঙ্গমাতার তুমি দান, কিন্তু ভবিষ্যৎ বঙ্গমাতার তুমি দাত্রী। বর্ত্তমান ভারতের, বর্ত্তমান জগতের তুমি সৃষ্টি-সুষমা, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারতের, ভবিষ্যৎ জগতের তুমি সুষমা-প্রসবিত্রী। বর্ত্তমান যুগের তুমি সৃষ্টি, ভবিষ্যতের তুমি স্রষ্ট্রী। তোমার দেহের প্রতি বিন্দু রক্ত ঐ ভবিষ্যৎকে গড়িবে। তোমার প্রতিবিন্দু অশ্রু ঐ ভবিষ্যৎকে গড়িবে। তোমার বুকের প্রতিবিন্দু দুগ্ধ ঐ ভবিষ্যৎকে পুষ্ট করিবে। তোমার প্রাণের প্রতি কণা স্নেহ, ভবিষ্যৎকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইবে। তোমার প্রজ্ঞার প্রতি রেখা-জ্যোতি ভবিষ্যৎ জগতের অমানিশা হরণ করিবে।

পত্র পড়িতে পড়িতে হয়ত ভাবিতেছ, পাগল ছেলেটা মাকে তার খামাখা অতিরিক্ত প্রশংসা করিতেছে। আমি স্বীকার করি, ছেলে যখন মায়ের গুণ গাহিতে বসে, তখন মুখে লাগাম কষিতে পারে না। কিন্তু এই যে তার মুখর প্রশংসা, তার প্রেরণা সত্য-সমুদ্রের অতল-তলে। তাই এই

প্রশংসায়, এই মাতৃস্তুতিতে তার বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বা অযাথার্থ্য থাকে না।

পুরুষের সহিত নারীর যখন তুলনা করিতে বসি, তখন আমি কোনও দিক্ দিয়াই মায়ের জাতিকে হেয়, নিকৃষ্ট বা নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিবার যোগ্য যুক্তি খুঁজিয়া পাই না। পূর্ব্ববর্ত্তী লোক-শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা বিচারকের আসনে বসিয়া রায় লিখিবার সময়ে নারীকে পাপ, নারীকে মৃত্যু, নারীকে নরকের দ্বার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, শতবার শতভাবে ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের সহিত কিছুতেই আমি একমত হইতে পারি না। অনেক শ্বেতাঙ্গ-বিচারক যে যে কারণে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন পূর্ব্বক কালা আদমীর প্রাণের মূল্য কয়েকটী মাত্র টাকা বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, আমার মনে হয়, নারী-নিন্দক লোক-গুরুগণের নারী-নিন্দার মূলেও তাহার অনুরূপ বহু কারণ বিদ্যমান ছিল। কেহ নিন্দা করিয়াছেন, মনে প্রাণে নারীকে নিন্দনীয় জানিয়া সহজ বিশ্বাসে, কিন্তু তাঁহাদের সরল বিশ্বাস দাঁড়াইয়া রহিয়াছে হয়ত ভ্রান্তিপূর্ণ বিচারের উপর। কেহ নিন্দা করিয়াছেন একটী বা দুইটী মাত্র দৃষ্টান্তকেই নারী-সাধারণের প্রতি প্রযোজ্য ভাবিয়া, কিন্তু ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা যে সমষ্টির বা জাতির চরিত্র-নির্ণয় হয় না, এই সহজ সত্যটী বিস্মৃত হইয়া। জন-সাধারণের মতের বিরুদ্ধতা করিয়া চলিবার গুরুতর শ্রম হইতে বাঁচিবার জন্যও কেহ কেহ নারী-নিন্দা করিয়াছেন। যে যুগে যে ভাব প্রবল থাকে, মহাশক্তিধর মহাপুরুষেরাও অনেক সময় নবতর মহাভাব বিতরণ করিবার সময়ে সেই পূর্ব্বতন ভাবটীকে আংশিক বা পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া নেন। শঙ্করাচার্য্য, তুলসীদাস প্রভৃতির নারী-নিন্দা আমি সেই শ্রেণীর মনে করি। কিন্তু যতই আমরা নূতন যুগের নূতন হাওয়ার স্পর্শ পাইতেছি, যতই ভবিষ্যতের মহাযুগের শুভ অরুণোদয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিতেছি, ততই যুগাবতারগণ নারীজাতির প্রতি অল্পতর বিদ্বিষ্ট ও অধিকতর সশ্রদ্ধ হইতেছেন। এইজন্যই আচার্য্য শঙ্কর ও গোস্বামী তুলসীদাসের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থক্য লক্ষিত হয় এবং এই জন্যই ভবিষ্যৎ যুগের আচার্য্যদের মধ্যে আমরা কতই না অত্যদ্ভুত পার্থক্য-সমূহ নিরীক্ষণ করিব।

আমি এক সময়ে নারীবর্জ্জনের ব্রত পালন করিয়াছি কিন্তু নারী-জাতির প্রতি ঘৃণাবশতই যে আমাকে স্ত্রীজাতির সকল সংশ্রব বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইয়াছিল, তাহা নহে। পরন্তু বিধাতার অদৃশ্য অভিপ্রায়ই বর্জ্জনের আইন আমার উপরে জারী করিয়াছিল। আইন মানিতে আমি বাধ্য, তাই তাহার প্রত্যেকটা ধারা নিষ্ঠার সহিত সুশৃঙ্খলার সহিত, আগ্রহের সহিত আমি মান্য করিয়াছিলাম। স্ত্রীলোকের মুখ আমি দর্শন করিতাম না, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর আমি শ্রবণ করিতাম না, যে পথে স্ত্রীলোক চলে, সে পথে আমি চলিতাম না, যে ঘাটে স্ত্রীলোক স্নান করে, সে ঘাটে আমি যাইতাম না। এমন কি, স্ত্রীলোকের ছবি দেখিতাম না, স্ত্রীলোকের নামোচ্চারণ করিতাম না। ত্রিপুরা জেলায় বাঘাউড়া গ্রামের ব্রহ্মদর্শিনী "বঙ্কুগোপালের মা" আমাকে ডাকিয়া নিয়া একদিন বলিয়াছিলেন,-"বাবা, তোমার সবই সুন্দর, শুধু ঐ স্ত্রীদর্শন-বর্জ্জনটাই অসুন্দর। উহা তুমি পরিত্যাগ কর। যে পথে স্ত্রীলোক চলিবে, সেই পথে সভক্তি নয়নে চাহিয়া থাক, আর মনে মনে জ্ঞান কর, যেন সাক্ষাৎ দশভুজা মা দুর্গাকে দর্শন করিতেছ।" আমি বলিয়াছিলাম "মা, এই বর্জ্জনের উৎস বিদ্বেষে নয়, ঘৃণায় নয়, অভক্তিতে নয়। যেখানে আমি একদিনের জন্যও মুখ ফুটিয়া নারীজাতির সম্পর্কে আমার কোনও আচার, নিয়ম, অভিপ্রায় বা নিষ্ঠার কথা কাহারও নিকটে ঘুণাক্ষরেও বলি নাই, এমন কি যেখানে আমি মনে মনেও নারীবর্জ্জন সম্বন্ধে কোনও কল্পনা করি নাই, যেখানে যখন আমাকে দেখিবামাত্র লোকের মনে সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, আমি নারীবর্জ্জনকারী, তখন সকলের এই প্রতীতির সম্মান আমাকে ঈশ্বরের আদেশ-জ্ঞানে রক্ষা করিতেই হইবে।" ভগবানের সেই আদেশ যতদিন না তিনি নিজে স্বাভাবিকভাবে আমার উপর হইতে তুলিয়া লইয়াছিলেন, ততদিন আমি সর্ব্বপ্রযত্নে সেই অদৃশ্য বিধাতার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ মান্য করিয়াছিলাম এবং অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ-নিচয়ের বিচার করিতে বসিয়া আজ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি যে, আইন মানিয়া আমি বলশালীই হইয়াছি।

কিন্তু তথাপি আমি নারীর মূল্য নির্ণয় করিতে বসিয়া কখনও বলিতে

পারি না যে, নারী নীচ, নারী হেয়, নারী ঘৃণ্য। জগতের অসংখ্য মহাপুরুষের পক্ষেই নারীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া চলা সম্ভব হইবে না সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে না যে, নারী ছোট। ★ ★ ★ ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

পুপুনকী আশ্রম

২৯শে চৈত্র, ১৩৩৪

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

মা, ★ ★ ★ তুমি সাধিকা, তোমার আবার অপ্রাপ্য এ জগতে কি আছে ভগবানের নামের যে সেবা করে, ব্রহ্মাণ্ড ত' সামান্য কথা, ব্রহ্মাণ্ডপতি ? স্বয়ং তাহার দাসত্ব করেন।

কিন্তু মা, তোমাকে প্রবল প্রয়াসে বিদ্যার্জ্জনও করিতে হইবে। সাধনের প্রতি যাহার তোমার ন্যায় তীব্র অনুরাগ, বিদ্যার্জ্জনের প্রতিও তাহার তীব্র অনুরাগ আজ দেশের দুরবস্থার মুখ চাহিয়া প্রার্থনীয় মনে করি। নারীজাতির সুপ্ত চৈতন্যের জাগরণ সম্পাদন করিতে যাহারা যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিবে, তাহাদের আজ সাধন-পুষ্ট শক্ত মেরুদণ্ডই সর্ব্বপ্রথমে চাই বটে, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিহীনা সাধিকা তপস্বিনী অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিশালিনী সাধিকা তপস্বিনীর যে মা মূল্য অনেক বেশী। সুতরাং তোমাকে বিদ্যার্জ্জনও করিতে হইবে।

গৃহস্থ-ঘরের সাধারণ কুলবধূর প্রতি আমার যে দৃষ্টি, তোমার প্রতি আমার দৃষ্টি তাহা হইতে অনেকটাই পৃথক্। যদি পতিব্রতা হয়, যদি স্বামীর নৈতিক অবনতির মুহূর্ত্তে নিজের চরিত্র ও মনুষ্যত্বের বলে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলেই আমি সাধারণ কুলবধূকে যথেষ্ট গুণান্বিতা বলিয়া মনে করি। কিন্তু তোমার মধ্যে এই দুইটী মহৎ গুণের অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু আমি প্রত্যাশা করি। আমি দেখিতে চাহি, তোমার জীবনের শিক্ষা ও সাধনা সমগ্র ভারতের পুনরভ্যুত্থানের মূলকে গিয়া শক্ত

করিয়াছে। আমি দেখিতে চাহি যে, ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ যে স্বর্ণ-কিরীটিনী মহিমময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, তুমি তাহার ভিত্তি গড়িবার একখানা পাকা-পোক্ত ইষ্টক হইয়াছ। অর্থাৎ যে আন্দোলনের প্রসার ঘটিলে সহজতম পন্থায় ও নিশ্চিততম উপায়ে জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ উন্নতি সংসাধিত হইবে, আমি তোমাকে সেই আন্দোলনের সৃষ্টি, পুষ্টি ও বিস্তারকল্পে জীবন উৎসর্গ করিতে আহ্বান করিতেছি। এই উৎসর্গ তোমাকে একাকী করিতে হইবে না। যাহার হস্ত ধরিয়া সংসারের প্রথম দায়িত্ব মাথায় লইয়াছিলে, তোমার সেই প্রাণাধিক স্বামীকে সঙ্গে করিয়া আজ তোমাকে ভারত-কল্যাণ-যজ্ঞের আহুতি সাজিতে হইবে। ভারত-কল্যান-সাধনা তোমাকে জগৎ-কল্যাণ-সাধনার যোগ্য করিবে। জগৎকে বঞ্চিত করিয়া, বর্জ্জন করিয়া শোষণ ও দোহন করিয়া ভারত কখনও আত্মকল্যাণ কল্পনাও করে নাই।

ভারতের মাটীতে জন্মিয়াছ, মুক্তির প্রার্থনা তোমার রক্তে, মাংসে, মেদে, মজ্জায় জড়াইয়া আছে। যাহাতে মুক্তি নাই, তাহাতে ভারতের পুত্রকন্যার রুচি নাই। কিন্তু মা, বিলাস-বাসনাই কি বন্ধন নহে ? ত্যাগই কি মুক্তি নহে? সুখের কামনায় যে বদ্ধ, সে ত' লৌহময় শৃঙ্খলে বদ্ধ।

তোমরা দুইজনে মা নবযুগের পুত্রকন্যা। তোমাদের জীবনের মধ্যে মুক্তিরই সুখাস্বাদ। তোমাদের দৃষ্টান্তের মধ্যে জগতের জন্য দেশ, দশ ও পরের জন্য সর্ব্বস্ব-বিসর্জ্জনই একমাত্র যথার্থ। তোমরা পূর্ণ, নিজেদিগকে বিলাইয়া দিয়া। তোমরা সত্য, নিজের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া। তোমরা ব্রহ্মানন্দের জ্যোতিঃ, পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়া, পরের ব্যথায় কাঁদিয়া।

একটী মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা যাইতে দিও না। অসামান্য শক্তি লইয়াই তোমরা আবির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু সেই মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিবার জন্য চাই একমাত্র একনিষ্ঠ অধ্যবসায়। ★ ★ ★ ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

পুপুনকী আশ্রম

৩১শে চৈত্র, ১৩৩৪

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

মা, পূর্ব্বে এক পত্রে তোমাকে লিখিয়াছি যে, নারীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। সুতরাং শিক্ষা যখন পুরুষকে উন্নত করে, তখন নারীকেও উন্নত অবশ্যই করিবে। কিন্তু দীর্ঘকাল যে নারী অশিক্ষার মোহাবরণে রহিয়াছে, আজ পুরুষের অপেক্ষা শিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজন তাহারই অধিক। অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া নারীজাতি নিজের ব্রহ্ম-স্বরূপকে আর একটী মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইয়া থাকুক, ইহা আমরা চাহি না। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ কত মহান্ হইবে, কত বিশাল হইবে, কত গৌরবের রত্নমুকুট শিরে ধারণ করিবে, সেই বিষয়ে অন্ধ থাকিয়া নারীজাতি আর একটী নিমেষের জন্যও অবসাদ-জড়তা-গ্রস্ত হইয়া অবস্থান করুক, ইহা আমরা চাহি না। অতীত ইতিহাসের প্রকৃত মহিমা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকিয়া শুধু সংস্কারের বশেই সে অতীতের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অন্ধ অনুরাগে আবদ্ধ থাকুক, ইহা আমরা চাহি না। আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট, যূথচ্যুত, ব্যূহভঙ্গ পুরুষজাতির ন্যায় বিদেশীর শিক্ষার মরীচিকা দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়া সে আলেয়ার আলোর পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াউক, ইহাও আমরা চাহি না। আমরা চাহি না যে, অতীতের মৃত কঙ্কালই নারী জাতির সর্ব্বস্ব হউক। আমরা ইহাও চাহি না যে, বর্ত্তমানের সভ্যতা অপরাপর জাতিকে যেমন করিয়া বিভ্রান্ত করিতেছে, ভারতীয় নারীকেও তেমন ভাবে দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্যা করিতে সমর্থ হউক। বেহুলা মৃতকঙ্কালের স্তূপ লইয়াই ভেলায় বসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ভবিষ্যতের পানে, লক্ষীন্দরের পুনর্জ্জীবনের প্রতি। প্রকৃত অশিক্ষিতা নারী কখনও ভবিষ্যৎকে এত বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তাই আমি স্ত্রী-শিক্ষার এত পক্ষপাতী।

বলিতে পার, শিক্ষা পাইলেই যে নারীর প্রাণে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হইবে, তাহার প্রমাণ কি ? কত নারী ত' লেখা-পড়া

শিখিতেছেন, বি-এ, এম-এ পাশ করিতেছেন, কালিদাস, ভবভূতি, শেলী ও শেক্সপীয়রের কাব্য-নিচয়-পাঠ করিয়া বিদুষী খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জনা ভবিষ্যতের প্রতি যথার্থই আস্থাসম্পন্না হইতে পারিয়াছেন ? কয়জনা ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে গৌরবমহান্ দীপ্তি -সমুজ্জ্বল করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ, সর্ব্বপ্রকার সুখলিপ্সা, সর্ব্বপ্রকার বিলাস-কামনা মহদাদর্শের পাদমূলে বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ? কয়জনের সর্ব্বজীবপ্রেম অকৃত্রিম প্রেম ? কয়জনের কল্যাণ-চেষ্টা অকৃত্রিম চেষ্টা ? কয়জনের পরিশ্রম নিঃস্বার্থ শ্রম ?

ইহার উত্তর এই যে, যাহা তোমাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে না, যাহা তোমাকে ভবিষ্যতের প্রতি শ্রদ্ধালু করে না, বর্ত্তমানের উপচারে যাহা তোমাকে ভবিষ্যৎকে পূজা করিবার প্রেরণা দেয় না, তাহাকে আমি শিক্ষা বলিয়া মানি না। কেতাব পড়িবার ক্ষমতাকেই আমি শিক্ষা বলিয়া স্বীকার করি না। মাসিক পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিবার নিপুণতাকেই আমি শিক্ষার সম্মান দেই না। যে শিক্ষা জাতির ভবিষ্যৎকে কল্যানের পথে, পূর্ণতার পথে, সামঞ্জস্যের পথে পরিচালিত করে, আমার মতে তাহাই যথার্থ শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রাণভরা প্রেম দেয়, মনজোড়া ত্যাগেচ্ছার বজ্র-বহ্নি দেয়, স্বার্থসুখকে ছোট করে, পরার্থকে বড় করে, আমি বলি, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। যাহা সামঞ্জস্যকে বিচলিত করে, পূর্ণতাকে রাহুগ্রস্ত করে, কল্যাণকে পরাহত করে, আমার মতে তাহা অশিক্ষা বা কুশিক্ষা।

পুরুষের অপেক্ষা নারীরই শিক্ষার প্রয়োজন অধিকতর। যেহেতু বুদ্ধ, শঙ্কর, রাণাপ্রতাপ,-ইহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমেই লাভ করেন মায়ের ক্রোড়, মায়ের বুকের দুগ্ধ, মায়ের মুখের স্নেহচুম্বন। দশ মাস দশ দিন জঠরে ধারণ কে করে ?-পিতা, না মাতা ? সন্তান প্রসবের দারুণ দুঃখ কে সহে ? পিতা, না মাতা ? শিশুর কোমল মনে মনুষ্যত্বের প্রথম রেখাপাত করা কাহার পক্ষে অধিকতর সহজ ও স্বাভাবিক ?-পিতার, না মাতার ? কাহাকে কেন্দ্র করিয়া গৃহীর গৃহ নবাগতের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠে ?-পিতাকে, না মাতাকে ?

সুতরাং জননীর জাতিকেই সর্ব্বাগ্রে সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিতে হইবে।

সুশিক্ষিতা মানে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে শিক্ষিতা। মস্তিষ্কে তাঁহার চিন্তা জাগাইতে হইবে, হৃদয়ে তাঁহার অনুভূতি দিতে হইবে, বাহুতে তাঁহার বলের সঞ্চার করিতে হইবে। জ্ঞানে তিনি হইবেন বাগ্‌দেবী সরস্বতী, স্নেহ-মমতায় তিনি হইবেন বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণা, তেজোবীর্য্যে তিনি হইবেন করালী কালী।

দেশ-মধ্যে জননীর জাতির সুশিক্ষার ব্যবস্থা আমরা আজ পর্য্যন্ত করিবার মত করি নাই। পুরুষজাতির আক্ষরিক শিক্ষার ব্যাপার লইয়াই আমাদের মস্তিষ্ক এমন ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অনেক সময়ে আমরা আবশ্যকীয়ও মনে করি নাই। ফলে, আমাদের সকল দেশকল্যাণচেষ্টার গোড়ায় পুঞ্জীভূত গলদ সঞ্চিত হইয়াছে। দেশব্যাপী আন্দোলন আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু সেই তূর্য্যধ্বনি নারীজাতির কর্ণে প্রবেশ করে নাই। কেন করে নাই ? যেহেতু, নারীজাতিকে শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, গুণে পুরুষজাতির সমকক্ষ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা কখনই উপযুক্ত ভাবে করি নাই। আজ আমি ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলন সৃষ্টি করিতে গিয়াও দেখিতেছি,-
"না জাগিলে যত ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।"

নারীজাতির মধ্যেও যতদিন না আত্মগঠন-চেষ্টা জাগ্রত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত একাকী পুরুষের চেষ্টায় সমগ্র ভারতীয় জাতির আর কতখানি উন্নতি সাধত হইবে ? পুরুষজাতির ভাবের সহিত যতদিন না নারীজাতির ভাবের স্রোতের সংযোগ সাধিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রচণ্ড শক্তিশালী আন্দোলন-সমূহও নিঃশক্তি ও অসাড়ের মত হইয়া থাকিবে। কেন না মাতা, ভগ্নী ও পত্নীর বিরুদ্ধতার শক্তিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বীরবিক্রমে কল্যাণ-কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে চিরকালই পুত্র, ভ্রাতা ও স্বামীর দল দ্বিধা-পীড়িত ও সঙ্কুচিত থাকিবে। সেই দ্বিধা ও সঙ্কোচের মূল আজ নারীজাতির মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার সর্ব্বতোবিস্তারের দ্বারা একেবারে উৎখাত করিয়া ফেলিতে হইবে। তবেই না বর্ত্তমানের দুঃখতমসা-সমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র নগণ্য নিকৃষ্ট ভারত ভবিষ্যতের মহাভারতে পরিণত হইবে।

ভাল আছি। কুশল দিও। ইতি- আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি ওঁ কলিকাতা

১৩ই পৌষ, ১৩৩৫

স্নেহের মা,

তোমার ব্রহ্মচর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আমাকে খুবই আনন্দিত করিয়াছিল। কারণ, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে সকল কর্ম্মক্ষেত্রে নিস্তেজ করিয়া রাখিয়াছে। এখন যদি দেশের মধ্যে কতকগুলি চিরসংযত শুদ্ধব্রত নরনারীর আবির্ভাব ঘটে, তাহা হইলে তাহাদের প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া সমগ্র জাতিকে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আস্থাশীল ও নিষ্ঠাবান্ করিয়া তুলিবে। ইহার ফল কি বর্ত্তমানে, কি ভবিষ্যতে অমৃতের ন্যায় শুভময় হইবে।

এই জন্যই তোমার চির-কৌমার্য্যের আকাঙ্ক্ষা দর্শনে আমি সুখী হইয়াছি। কিছুতেই যে তুমি বিবাহ করিতে সম্মত নহ, তাহা শুনিয়া আমি ব্যথিত বা বিরক্ত হই নাই। কিন্তু তোমার কৌমার্য্যের আকাঙ্ক্ষা যে কতখানি গভীর, তাহা ত' আমি জানিতে পারি নাই মা!

★ ★ ★ ★ ★

আকাঙ্ক্ষা যদি গভীর না হয়, তাহা হইলে সে কৌমার্য্য রক্ষা করা যায় না, তাসের ঘরের মত তাহা একটু বাতাসেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রথম উদ্যমে অনেকেই চিরব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কল্পকে অবিনশ্বর বলিয়া মনে করে কিন্তু দুদিন পরে হয়ত নানা সুখলোভের জালে জড়াইয়া পড়ে। অনেকেই ত্যাগের সাধনাকে প্রথম উত্তেজনায় প্রাণসম প্রিয় জ্ঞান করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরে কিন্তু হয়ত দুইদিন না যাইতে বাসী ফুলের মত আবর্জ্জনার স্তূপে ফেলিয়া দেয়। অনেকেই জীবনের প্রথম প্রভাতে মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া নির্ভয়ে পথ চলিতে আরম্ভ করে কিন্তু হয়ত মধ্যাহ্ন-গগনে পৌছিতে না পৌছিতে নিজের ইচ্ছায় চরণ-যুগলে লৌহশৃঙ্খল পরিয়া বসে, পথ চলায় ক্ষান্ত দেয়।

তাই তোমাকে মা সর্ব্বাগ্রে আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে। আগে তোমাকে নিজের স্বরূপ জানিতে হইবে। আগে তোমাকে নিজের সবলতা ও দুর্ব্বলতার ওজন বুঝিতে হইবে। ★★ শ্রীভগবান্ তোমার কল্যাণ করুন। ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

(জনৈকা ব্রহ্মচারিণীর প্রতি)

হরি ওঁ কলিকাতা

১৭ই পৌষ, ১৩৩৫

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

স্নেহের মা, সেদিন আসিবার সময়ে যাহা বলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম এই যে, তোমার মধ্যে শুধু সুরুচি দেখিলেই খুশী হইব না, সাধনাও দেখিতে চাই। সৎ বিষয়ে মন গিয়াছে, ভাল কথা। জগতের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়াছে, সুখের কথা। পরের কথায় হৃদয় গলিয়াছে, আহ্লাদের কথা। স্বার্থ ও আত্মসুখের প্রতি অনাস্থা ও অপ্রীতি জন্মিয়াছে, প্রশংসার কথা। কিন্তু ইহাই ত' যথেষ্ট নয় মা। যে মঙ্গলময় উদ্দেশ্যের প্রতি মন ধাবিত হইয়াছে, তাহাকে সম্পাদন করা চাই। যাহাদের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাহাদের দুঃখ দূর করিতে পারা চাই। যে সকল ক্ষণিক সুখ ও ভোগ-কামনার প্রতি তোমার বিরাগ জন্মিয়াছে, তাহাদের প্রলোভন পুনরায় কখনও যাহাতে তোমাকে অভিভূত করিতে না পারে, তাহাদের মোহিনী-মায়া যাহাতে কখনও কুমন্ত্রণা দিবার জন্য কাছে আসিতে সমর্থ না হয়, তাহার জন্যও তোমাকে যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে হইবে। শুধু সু-রুচিই এই যোগ্যতা দান করিবে না; সু-রুচি তোমাকে এই যোগ্যতা লাভে উৎসাহিত করিবে মাত্র, কিন্তু যোগ্যতাকে অর্জ্জন করিতে হইবে সাধনারই দ্বারা।

"সাধনা" বলিতে সাধারণতঃ 'অধ্যবসায়' বুঝায়। কিন্তু এখানে আমি মা ভগবৎ-সাধনার কথাই বলিতেছি। তোমার সু-রুচিকে দৃঢ় করিতে হইবে

এই সাধনারই দ্বারা। কেননা, সাধনহীন সদিচ্ছা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের যে আলেখ্য মনে মনে অঙ্কিত করিয়াছ, তাহার মধ্যে কোথায় কোন্ ভুল, কোন্ ত্রুটী, কোন্ অসম্পূর্ণতা দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া লুকাইয়া রহিয়াছে, সাধনের বলে তোমাকে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। সাধনের বলেই তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইবে এবং কোন্ বিষয়ে কতটুকু অসম্পূর্ণতা তোমার মধ্যে রহিয়াছে, তাহা ধরা পড়িবে। এই সকল অসম্পূর্ণতাকে দূরীভূত করিতে হইবে মা একমাত্র ভগবৎসাধনেরই দ্বারা।

কোন্ বিষয়ে তোমার অসম্পূর্ণতা কতটুকু, তাহা বুঝিবার দিগ্‌দর্শন যন্ত্র হইতেছে— তোমার কামনা ও বাসনা। যেখানে দেখিবে, প্রাণের মধ্যে বাসনার তরঙ্গ উঠিতেছে, সেখানেই বুঝিবে, তোমার কিছু অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। এই বাসনানিচয় যত গভীর হইবে, তোমার ভিতরের অপূর্ণতাও তত অধিক বলিয়া জানিবে। বাসনার তরঙ্গ যত অল্প হইবে, বাসনার স্রোত যত ধীরগামী হইবে, তোমার ভিতরের অপূর্ণতাও তত অল্প বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ, অভাববোধই অপূর্ণতার প্রধানতম লক্ষণ। কোনও কিছু না পাইলে যদি ভিতরে অস্বস্তি জন্মে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, এই বিষয়ে তুমি অপূর্ণ আছ।

কিন্তু এই অপূর্ণতা তুমি দূর করিবে কিসের বলে ? আমি বলি, দূর করিবে সাধনের বলে। সু-রুচি, সু-মতি, সুবুদ্ধি বা সদিচ্ছার দ্বারা অপূর্ণতা দূর হয় না,—মনকে কুপথ হইতে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা মাত্র করা যায়। পরন্তু সাধনের বল থাকিলে রুচি, মতি, বুদ্ধি এবং ইচ্ছা এমন দৃঢ়তা লাভ করে যে, সকল প্রলোভনকে জয় করিবার সামর্থ্য তাহাদের হয়।

এমন অনেক সময় হয়, যখন মনের ভিতর কোনও কামনা বা বাসনার দৌরাত্ম্য বিন্দুমাত্রও অনুভূত হয় না। তখন লোকে ভুল করিয়া নিজেকে পূর্ণ বলিয়া ভাবে। কিন্তু দুই দিন না যাইতেই হয়ত' এক ভয়ঙ্কর বাসনা হিংস্র পশুর মত গর্জ্জিয়া উঠিল এবং কিছুকাল পূর্ব্বেই যিনি ছিলেন শুকদেবের মত জিতেন্দ্রিয়, তিনিই হইয়া বসিলেন বিষ্ঠার কীটের মতন দুর্গন্ধলিপ্সু।

এই সকল স্থলে ভগবৎ-সাধনাই হইতেছে আত্মপরীক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। স্থির মনের মধ্যেও কোথায় চঞ্চলতার বীজ লুকাইয়া আছে, দেবভাবের মধ্যেও কোথায় নারকীয় বুদ্ধি সঙ্গোপনে বিরাজ করিতেছে, ত্যাগের সুন্দর পরিচ্ছদের অন্তরালে কোথায় ভোগের লিপ্সা প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছে, তাহা ধরিবার উপায় ভগবৎ সাধনা। গভীর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াই চোর তাহার হাতিয়ার লইয়াই গৃহস্থের ঘরে সিঁদ কাটিতে যায়। অনেক অনেক গোপন পাপ এমনি ভাবেই লুকাইয়া থাকে। তাহাদিগকে জানিবার, চিনিবার এবং উচ্ছেদ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে ভগবৎ-সাধনা।

আর একদিন তোমাকে লিখিয়াছি,—ভাবহীন বৈরাগ্য বেশীদিন টিঁকে না। আজ তোমাকে বলিতে চাহি যে, সাধনহীন ভাব সুপুষ্ট হয় না। তোমাকে প্রাণ দিয়া সাধন করিতে হইবে। দেশের সেবা করিতে চাহ, করিও, কিন্তু মা সাধনের অসীম শক্তি তোমাকে দুই বাহুতে সঞ্চয় করিতে হইবে। পরের দুঃখ নিবারণ করিতে চাহ, করিও, কিন্তু মা, এমন সাধনশক্তি তোমাকে অর্জ্জন করিতে হইবে যেন, তোমার শুদ্ধ চিত্তে পরের দুঃখ প্রকৃতই তার পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া ফেলিতে পারে। জগৎকল্যাণের যে ভাবটাই তোমার মনের মধ্যে জাগুক, যেন অন্নবস্ত্রহীন ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মত কৃশকায় ও দুর্ব্বল না হয়। এমন সুতীব্র সাধন তোমাকে করিতে হইবে, যেন তোমার মনের মধ্যে অজ্ঞাতসারেও কোন দুর্ব্বল বা শক্তিহীন চিন্তার উদয় না হইতে পারে। ★ ★ ★ ইতি-

শুভাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮)

(জনৈকা সধবা মহিলার প্রতি)

হরি ওঁ

কলিকাতা
২০শে পৌষ, ১৩৩৫

নিত্যনিরাপদাসুঃ-

স্নেহের মা, ★ ★ ভগবানের নাম সকল অন্ধকারের মধ্যে আলোক-বর্ত্তিকার কার্য্য করে, সকল অজ্ঞানতার মধ্যে জ্ঞানের দীপ্তি জ্বালাইয়া দেয়। মনে-প্রাণে যে নামের সেবা করে, তাহার আর কোনও বিষয় অজ্ঞাত থাকে না।

এখানে "মনে-প্রাণে" কথাটীর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সাধারণতঃ কথায় কথায়ই লোক "মনে-প্রাণে" কথাটার ব্যবহার করে, ইহার অর্থ সম্বন্ধে ততটা সচেতন থাকে না। কিন্তু সাধক-সমাজে ইহার অনেক গূঢ় অর্থ প্রচলিত আছে। সাধকেরা 'মন' বলিতেই ভ্রূমধ্যের কথা ভাবেন। কারণ, যোগশাস্ত্রের মতে মনের সহজ প্রকাশের স্থান হইতেছে, ভ্রূমধ্যে। সাধকেরা বলেন, -ভ্রূমধ্যে তৃতীয় নয়ন আছে, সেখানেই দিব্য দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে, সেখানে মন স্থির হইলেই তত্ত্বদর্শন হয়।

'প্রাণ' বলিতে সাধারণতঃ যোগীরা বোঝেন শ্বাস বায়ু। প্রাণের দুইটী অবস্থা। একটী হইতেছে বহির্গামিনী অবস্থা,—এ অবস্থায় -'প্রাণ'—কে বলা হয় প্রশ্বাস। অপরটী হইতেছে অভ্যন্তরগামিনী অবস্থা—এ অবস্থায় প্রাণকে বলা হয় শ্বাস। আমরা শ্বাসকে গ্রহণ করি, প্রশ্বাসকে ত্যাগ করি। এই শ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাম জপ করার নাম হইল প্রাণযোগে জপ করা। মনকে ভ্রূমধ্যে রাখিয়া যদি কেহ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাম জপ করে, তাহা হইলে 'প্রাণে মনে' ঐক্য করা ইহল।

★ ★ ★ ★ ★

সংসারের সকল কাজ করিতে করিতেও নাম-জপ করা যায়। এমন কি, যে সময়ে দেহ সাত্ত্বিক ও রাজসিক কার্য্যসমূহ হইতে বিরত হইয়া শুধু তামসিক ব্যাপারে নিযুক্ত রহে, সেই সময়েও শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম সাধন করা যায়।

★ ★ ★ ★ ★

শ্রীনামের হাতে শ্বাস ও প্রশ্বাসকে সঁপিয়া দাও এবং যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে দেহটাকে সংসারের কাজে নিযুক্ত কর। মন যাহা চাহে না, সংসারীর অনুরোধে দেহকে এমন সহস্র কাজে নিয়োজিত করিতে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র ভয় পাইও না। দেহ দেহের কাজ করুক কিন্তু মনটী ভ্রূমধ্যে ডুবিয়া থাকুক, শ্বাস প্রশ্বাস যাইতে আসিতে নিয়ত মহানাম স্মরণ করুক। এই ভাবেই সংসারীকে সংসার জয় করিতে হইবে।

মনের মধ্যে বিশ্বাস রাখিও, শুধু বিশ্বাস নয়, গভীর বিশ্বাস রাখিও, তুমিই মহাশক্তি জগজ্জননী, তুমিই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী মা,—তুমিই

নবযুগের নারী

পরমানন্দস্বরূপিণী পরমেশ্বরী, তুমিই চরাচর-বিহারিণী বিশ্ব-প্রসবিনী। মহাশক্তি মা এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের দেহ হইতে ক্ষুদ্র একটুখানি দৈহিক উপাদান ধার লইয়া আসিয়া সসীম হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছে এবং বিভিন্ন ঘটনার আবর্ত্তনে নিজেকে নিপাতিত করিয়া মনে মনে অভিমান করিতেছে,-"আমি অমুকের কন্যা, অমুকের ভগ্নী, অমুকের পত্নী, অমুকের ভ্রাতৃবধূ, অমুকের পুত্রবধূ, আর অমুকের শিষ্যা।" এই অভিমান-বশেই সে মনে করিতেছে,-"অমুকের সহিত আমার ভক্তির সম্বন্ধ, অমুকের সহিত আমার প্রীতির সম্বন্ধ, অমুকের সহিত আমার প্রণয়ের সম্বন্ধ, অমুকের সহিত আমার ঠাট্টা-রসিকতা-বিদ্রূপের সম্বন্ধ, অমুকের সহিত আমার বিনয়নম্র আজ্ঞানুবর্ত্তিতার সম্বন্ধ, আর অমুকের সহিত আমার ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণের সম্বন্ধ।" নিজেকে তুমি সীমাবদ্ধ-ভাবে দেখিতেছ বলিয়া প্রবৃত্তিনিচয় তোমাকে ঘিরিয়া ধরিতেছে। কিন্তু ইহারা কি প্রকৃতই প্রবৃত্তি? না মা, তাহা নহে। নিজেকে তুমি সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ বলিয়াই বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তনী লীলা তোমার কাছে সীমাবদ্ধ রূপ ধরিয়া প্রকটিত হইতেছে এবং প্রকৃতির সেই সীমাবদ্ধ নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া তুমি চমকিয়া উঠিতেছ। কিন্তু তুমি যে মা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অতীত বস্তু! নিজেকে তুমি সীমাবদ্ধ দেখিতেছ, তারই জন্যে তোমার স্নেহ, তোমার ভক্তি, তোমার প্রীতি, তোমার প্রণয়, তোমার বিনয়, তোমার শ্রদ্ধা, সবই সীমাবদ্ধ রহিয়া যাইতেছে। যতক্ষণ তুমি নিজে সীমাবদ্ধ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার পিতৃভক্তিও সীমাবদ্ধ, তোমার ভ্রাতৃ-প্রীতিও সীমাবদ্ধ, তোমার স্বামিপ্রেমও সীমাবদ্ধ, তোমার গুরুশ্রদ্ধাও সীমাবদ্ধ। যে মুহূর্ত্তে তুমি নিজেকে জানিলে অসীম, সেই মুহূর্ত্তে তোমার পিতাও হইলেন অসীম, ভ্রাতাও হইলেন অসীম, স্বামীও হইলেন অসীম, গুরুও হইলেন অসীম। পিতা যতক্ষণ সসীম, ততক্ষণ তাঁহার ভালবাসার নিঃস্বার্থতায় সন্দেহ থাকে। ভ্রাতা যতক্ষণ সসীম, ততক্ষণ তাঁহার স্নেহ-প্রীতির অকৃত্রিমতায় সংশয় থাকে। স্বামী যতক্ষণ সসীম, ততক্ষণ তাঁহার প্রেমের অকপটতায় অবিশ্বাস থাকে। গুরু যতক্ষণ সসীম, ততক্ষণ তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণতায় অনাস্থা থাকে। এই যে সংশয়, এই যে সন্দেহ, ইহাই

ঘনীভূত হইয়া তোমার মনকে সংস্কারের জগতে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখে। এই যে অনাস্থা, এই যে অবিশ্বাস, তাহাই তোমার প্রবৃত্তির সাগরে উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গ তোলে।

এই অনাস্থা ও এই অবিশ্বাসকে তোমার পরাজিত করিতে হইবে। কিন্তু পরাজিত করিবে কিসের বলে ? ইহার একমাত্র উত্তর আত্ম-সাক্ষাৎকারের বলে। তোমাকে আত্মদর্শন করিতে হইবে। তুমি যে কে, তাহা চিনিতে হইবে। সাধনের বলে তোমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, তুমিই তোমার পিতা সাজিয়া তোমাকে জন্ম দিয়াছ কিনা, তুমিই তোমার মাতা সাজিয়া তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছ কিনা, তুমিই তোমার ভ্রাতা সাজিয়া নিজেকে ভালবাসিয়াছ কিনা, তুমিই তোমার স্বামী সাজিয়া নিজের পাণিগ্রহণ করিয়াছ কিনা, তুমিই তোমার পুত্রকন্যা সাজিয়া নিজেকে মা বলিয়া ডাকিয়াছ কিনা, তুমিই তোমার গুরু সাজিয়া নিজেকে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী করিয়াছ কিনা।

তুমি একাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-রূপে প্রকাশ হইয়াছ, আবার তুমিই তোমার সহিত নানা সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছ। যাহার সহিত যে সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছ, তাহার সহিত সেই সম্বন্ধের মর্য্যাদানুরূপ ব্যবহার তোমাকে করিয়া যাইতে হইবে কিন্তু অনুভূতিতে জানিয়া যাইতে হইবে, তুমি এবং সে দুই নহ, দুই-ই এক, একই দুই। স্বরূপতঃ দুইই এক, বাহ্যতঃ একই দুই। স্বরূপতঃ তোমাতে আর তোমার পিতাতে ভেদ নাই, বাহ্যতঃ একই তুমি কন্যা ও পিতাতে পরিণত হইয়াছ। স্বরূপতঃ তোমাতে আর তোমার স্বামীতে ভেদ নাই, বাহ্যতঃ একই তুমি স্বামী ও স্ত্রীতে পরিণত হইয়াছ। স্বরূপতঃ তোমাতে আর তোমার গুরুতে ভেদ নাই, বাহ্যতঃ একই তুমি শিষ্যা ও গুরুতে পরিণত হইয়াছ। স্বরূপতঃ তুমি অসীম, তাই পিতার সহিত, স্বামীর সহিত, গুরুর সহিত তোমার সম্বন্ধও অসীম। বাহ্যতঃ তুমি সসীম, তাই পিতার সহিত তোমার সম্বন্ধ শুধু কন্যা-জনোচিত, স্বামীর সহিত তোমার সম্বন্ধ শুধু পত্নী-জনোচিত, গুরুর সহিত তোমার সম্বন্ধ শুধু শিষ্যাজনোচিত। বাহ্যতঃ তুমি একজনের প্রতি অপর জনের যোগ্য ব্যবহার

করিতে পার না। কেননা, অসীম ব্রহ্ম যখন একটি নির্দ্দিষ্ট দেহের মধ্য দিয়া সসীম বিগ্রহ ধারণ করেন, তখন তিনি কোনও ক্রমেই সেই সীমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। কারণ, অখণ্ড-অবস্থায় অসীমত্বও যেমন তাঁহার, খণ্ডাবস্থায় সীমাও যে মা তাঁহারই। তুমি যে একটী সসীম নারীদেহে রহিয়াছ, ইহা তাঁহারই সসীমতা। এই সসীমতার ধর্ম্ম পিতার সংস্পর্শে একপ্রকার, স্বামীর সংস্পর্শে আর একপ্রকার, গুরুর সংস্পর্শে তৃতীয় প্রকার। এই সসীমতার প্রকার পিতার সম্পর্কে একপ্রকার, স্বামীর সম্পর্কে একপ্রকার, গুরুর সম্পর্কে আর এক প্রকার। এই সসীমত্বের দাবী পিতার উপরে একপ্রকার, স্বামীর উপরে একপ্রকার, গুরুর উপরে আর এক প্রকার। এই সসীম দেহ তাহার সার্থকতা আহরণ করিবে এক এক জনের প্রতি এক এক প্রকার ব্যবহার করিয়া। এই সসীম ইন্দ্রিয়নিচয় তাহাদের সম্যক্ দাবী মিটাইবে এক এক জনের প্রতি এক এক প্রকারে সমুপস্থিত করিয়া। একের প্রতি যে ব্যবহার যোগ্য, অপরের প্রতি সে ব্যবহার অযোগ্য হইবে, ধর্ম্ম-সংস্কারের কারণ হইবে। বাহ্য জগতের সসীমতার দাবী তোমাকে বাহ্য জগতের মান রাখিয়া চলিতে বাধ্য করিবে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইহা প্রবৃত্তি নয়, ইহা ব্যবহারিক কর্ত্তব্য। কেননা, তুমি ব্রহ্মময়ী জগজ্জননী, প্রবৃত্তির তুমি প্রভু, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির তুমি অতীত। যাহাকে প্রবৃত্তি বলিয়া চিত্তে সংক্ষোভ অনুভব করিতেছ, তাহার পশ্চাতে তুমি তোমার ব্রহ্মসত্তাকে দর্শন কর। যাহাকে আসক্তি বলিয়া বোধ করিতেছ, তাহার পশ্চাতে তুমি তোমার অখণ্ড-স্বরূপের অনুভূতিকে স্বীকার কর। সকল চঞ্চলতার পশ্চাতে যে তোমার অচঞ্চল ব্রহ্মত্ব বিরাজ করিতেছে, সকল বিক্ষোভের মূলদেশে যে বিক্ষোভাতীত পরব্রহ্ম দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, সাধনবলে উহা উপলব্ধি কর।– দেহ ও মনের সকল চাঞ্চল্যের প্রতীক হইতেছে শ্বাস ও প্রশ্বাসের চিরচাঞ্চল্য। সর্ব্বাগ্রে এই চঞ্চল বায়ুগতির মধ্যে ব্রহ্মাস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টাবতী হও।

ভাল আছি। পরমমঙ্গলময় তোমার কুশল করুন। ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

(জনৈকা সধবা মহিলার প্রতি)

ওঁ তৎসৎ কলিকাতা

২১ পৌষ, ১৩৩৫

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

স্নেহের মা, ★ ★ ★ আমার দৃষ্টিতে নারী শুধু নারীই নহে। সে যে আমার মা, আমার স্তন্যরসবিধায়িনী জগজ্জননী। আমার দৃষ্টিতে নারী শুধু নারীই নহে, সে যে মায়ার অতীত মহামায়া, সকল মায়ামোহের বিধ্বংসকারিণী শিবজায়া। আমার দৃষ্টিতে নারীর চক্ষু কুরঙ্গনয়নই নহে, এ চক্ষু সকল সন্তানের মোহতমসাচ্ছন্ন জড়তাবিপন্ন প্রাণকে জাগাইবার জন্য স্নেহসিক্ত বিদ্যুতের অফুরন্ত আধার। আমার দৃষ্টিতে নারীদেহ স্ত্রীদেহই নহে, এদেহ একান্ন পীঠস্থানের সম্মিলিত মহাতীর্থ। আমি তোমাদের ভবিষ্যতের প্রতি অশ্রদ্ধা করি না।

সন্তান মায়ের কাছে অনেক দাবী করিতে পারে। আমি তোমার কাছে তোমার জাগরণের দাবী করিতেছি। তুমি যে মা ভগবতী, এই বিশ্বাসে তোমাকে প্রদীপ্ত হইতে হইবে। তুমি যে মা মহামায়া, এই তত্ত্বের উপরে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

ভগবতী কে ?-যিনি ঈশ্বরত্বশালিনী। মহামায়া কে ?-যিনি মায়ার অতীত হইয়াছেন। যিনি নিজেই ঈশ্বরী, যিনি নিজের উপরে কামকে ঈশ্বর হইতে দেন না, ক্রোধকে ঈশ্বর হইতে দেন না, বিদ্বেষকে ঈশ্বর হইতে দেন না, কামনা, বাসনা বা লালসাকে ঈশ্বর হইতে দেন না, আসক্তিকে ঈশ্বর হইতে দেন না, পূর্ব্বসংস্কারকে ঈশ্বর হইতে দেন না, ভ্রমকে ঈশ্বর হইতে দেন না, ভ্রম-জাত পতনকে ঈশ্বর হইতে দেন না, তিনিই ভগবতী। যিনি নিজের উপরে মায়ার অধিকার স্বীকার করেন না, চঞ্চলতার অধিকার স্বীকার করেন না, ক্ষণিক সুখের অধিকার স্বীকার করেন না, ভোগলিপ্সার অধিকার স্বীকার করেন না, নীচতা, কপটতা বা মিথ্যার অধিকার স্বীকার করেন না, তিনিই মহামায়া।-ভোগে জগৎকে আবৃত করিয়া

রাখিয়াছে,-ভগবতী তাহা হইতে রক্ষা করেন। মায়ায় ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন হইয়াছে, -মহামায়া তাহা হইতে উদ্ধার করেন।

আমার দাবী মা, আজ ভগবতীর রূপ ধরিয়া আসিয়া সন্তানের চখের সম্মুখে দাঁড়াও। একবার মহামায়ার সাজে সাজিয়া মায়াচ্ছন্ন পুরুষজাতিকে পতনের পঙ্কাবর্ত্ত হইতে টানিয়া তোল।

আমি বলিতেছি না, তুমি সন্ন্যাসিনী হও। বিবাহিতা তুমি, তোমাকে আমি গার্হস্থ্য জীবনের দিকেই দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে কহিতেছি। সংসারীই তোমাকে করিতে হইবে, কিন্তু সন্ন্যাসিনীরই ন্যায় দৃঢ়চিত্ত হইয়া। স্বামীকে লইয়াই তোমাকে জয়যাত্রার পথে বহির্গত হইতে হইবে। তিনি যদি তোমার সাহচর্য্যের অযোগ্য হন, তবে, তাহাকে তোমার নিজের তপস্যার শক্তিতেই যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। তুমি যে মা মহাশক্তি,-ইচ্ছা করিলেই তুমি তাহা করিতে পার। ইচ্ছা করিলেই তুমি তাঁহার দেহকে, তাঁহার মনকে, তাঁহার রুচিকে, তাঁহার প্রবৃত্তিকে তোমার মতন করিয়া গড়িয়া লইতে পার। ইচ্ছা করিলেই তুমি তাঁহাকে তোমার মনের মতন ভাবে পাইতে পার। সে শক্তি তোমার প্রকৃতই আছে। ভ্রান্তিবশে নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করিয়া যতই তুমি মনে মনে পরিক্লিষ্টা হও না কেন, সে সামর্থ্য তোমার যথার্থই আছে।

★ ★ ★ ★ ★

পরমমঙ্গলময় তোমার মঙ্গল করুন। ইতি-

আশীর্ব্বাদক

তোমার পাগলা ছেলে

স্বরূপানন্দ

(১০)

(জনৈকা ব্রহ্মচারিণীর প্রতি)

হরি ওঁ কলিকাতা

২২শে পৌষ, ১৩৩৫

স্নেহের মা-,

সমগ্র জীবন দিয়া তোমাকে সত্যানুসরণ করিতে হইবে, যেদিকে

সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, সেই দিকেই তোমাকে ছুটিয়া যাইতে হইবে, সত্যের জন্যই তোমাকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। সত্য তোমার কাছে কৌমার্য্যের পথে কি গার্হস্থ্যের পথে ধরা দিবে, তৎ-সম্বন্ধে আগে হইতেই একটা গোঁড়া মতামত পোষণ করিয়া বসিবার কোনও প্রয়োজন নাই এবং তুমি তাহা করও নাই। সেই জন্যই তুমি আমার বিশেষ প্রশংসার পাত্রী হইয়াছ।

যথার্থ কথা বলিতে কি, দেশের সেবা করিতে হইলেই যে কাহাকেও কৌমার্য্যও অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নহে। অনেককে বিবাহও করিতে হইতে পারে। আবার, কাহারও পক্ষে বিবাহ-বর্জ্জন করিয়া কঠোর উদ্যম সহকারে কৌমার্য্যের আদর্শকেই সুদৃঢ় হস্তে ধরিতে হইতে পারে। যাহার পক্ষে যে আদর্শই ধরিতে হউক না কেন, যাহার পক্ষে যাহা গ্রহণীয়, সে যাহাতে তাহা বীরের মতই গ্রহণ করিতে পারে, প্রকৃত সত্যসেবকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিবে সেই দিকে। কৌমার্য্যের আদর্শ যাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, সে যাহাতে সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া বা জীবন-সংগ্রামে পরাজয়ের আতঙ্কে অভিভূত হইয়াই চিরকুমারী না হয়, পরন্তু সত্যসাধনার প্রতি দৃঢ়া নিষ্ঠাই যাহাতে তাহাকে কৌমার্য্যের পথে প্রেরণ করে, তাহাই দেখিতে হইবে। বিবাহিত জীবনের আদর্শ যাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, সে যাহাতে কামাদি লালসার প্রচ্ছন্ন তাড়নায় বাধ্য হইয়াই সংসারী জীবন গ্রহণ না করে, পরন্তু বিমল কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই যাহাতে সে গার্হস্থ্য গ্রহণ করে, ইহাই দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, – ভয় বা প্রবৃত্তি, আত্ম-অবিশ্বাস বা লালসা যেন কাহারও ঘাড়ের উপরে চাপিয়া বসিয়া তাহাকে কাপুরুষের মত সংসার-ক্ষেত্র হইতে পলায়মানা বা মোহাবিষ্টের মত সংসারে কৃমিকীট না করিতে পারে। দেখিতে হইবে,- যে সংসারী হইবে, সে যেন জ্ঞানসূর্য্যের প্রদীপ্ত কিরণে নিজের পথ নিজে দেখিয়াই গার্হস্থ্যের পথে প্রবেশ করে, আর যে কুমারী রহিবে, সে যেন দিব্য জগতের দিব্য বাণী নিজ কাণে শুনিয়াই কৌমার্য্যের সঙ্কল্পে আরূঢ় হয়।

"চিরকুমারীই রহিব"– এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া সাধন (ভগবৎ সাধন)

আরম্ভ করার আমি পক্ষপাতী নহি। সাধন আরম্ভ করিতে হইবে "সত্যলাভ করিব" – এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া। সাধনের তীব্রতাই অন্ধকারে আলো জ্বালিয়া দিবে, শত বিভ্রান্তির মধ্যেও ঠিক্ ঠিক্ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, কোন্‌টী তোমার পথ আর কোনটী তোমার অপথ। সকলের পক্ষে সকল বস্তু সুপথ্য নহে, সকলের পক্ষে সকল পন্থা গ্রহণীয় নহে। একজনের পক্ষে যাহা বিষ, অপরের পক্ষে অনেক সময়ে তাহা অমৃত হওয়াও বিচিত্র নহে। কাহার পক্ষে কোন্‌টী বিষ, কাহার পক্ষে কোন্‌টী অমৃত, তাহা নির্দ্দেশিত হইবে সাধনের বলে।

আবার তীব্র সাধনের ফলে যে পথ তোমার গ্রহণীয় বলিয়া জানিবে, তাহাতেও দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকিবার জন্য তীব্রতর সাধন প্রয়োজন। আমি এই জন্যই কৌমার্য্য-সঙ্কল্পের চেয়েও সাধনের দৃঢ়তার প্রতি তোমার সমগ্র মন ও সমগ্র দৃষ্টিকে অধিকতর আকর্ষণ করিতে চাহিতেছে।

কৌমার্য্য বা বিবাহ স্বদেশ-প্রেমের প্রমাণ নহে। স্বদেশপ্রেমের প্রমাণ হইতেছে, দেশের দুঃখানুভব করার মধ্যে। প্রতিদিনকার অন্নগ্রাস মুখে তুলিবার সময়ে লক্ষ লক্ষ অনাহারক্লিষ্ট স্বদেশবাসীর জঠর-জ্বালার কথা স্মরণে যখন কাহারও চক্ষে অশ্রু ঝরে, তখন সেই অশ্রুবিন্দুগুলিই হয় স্বদেশপ্রেমের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অথবা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিব, সেই অশ্রুবিন্দু যখন কাহাকেও ইহাদের দুঃখ বিদূরণে করে নিয়োজিত, তখন হয় স্বদেশ-প্রেম প্রমাণিত।

তুমি তোমাকে কোনও অবস্থায়ই সামান্য বলিয়া মনে করিও না। ভগবানের জন্য যাহারা নিজেদিগকে সংসারের জালে বদ্ধ করে, ভগবান্ নিজ হাতে তাহাদের বন্ধন কাটিয়া দেন। আবার, ভগবানের জন্য যাহারা সাংসারিক সুখভোগের লিপ্সা ত্যাগ করে, তাহারা ভগবানের শক্তি ও বীর্য্য পায়; সংসারে যদি তোমাকে প্রবিষ্ট হইতে হয়, তোমাকে বীরের মত সংসারী করিয়া যাইতে হইবে। আর, কৌমার্য্যের প্রদীপ্ত পথ যদি তোমাকে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তোমাকে সূর্য্যের মত থাকিতে হইবে কলঙ্কলেশহীন,

সমুদ্রের মত হইতে হইবে জ্ঞানে সুগভীর, হিমালয়ের মত হইতে হইবে পবিত্রতায় অভ্রভেদী।

★ ★ ★ ★ ★

ভাল আছি। মঙ্গলময় কুশল করুন। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১)

(জনৈকা ব্রহ্মচারিণীর প্রতি)

পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই মাঘ, ১৩৩৫

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

স্নেহের মা, ★ ★ ★ যার চিত্ত যত শুদ্ধ, তার হৃদয় পরের ব্যথায় তত গলে, জগতের দুঃখে তত কাঁদে। অশুদ্ধচেতার পরদুঃখবোধ কখনও গভীর হয় না, দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং দুঃখবিদূরণের চেষ্টা বা উপায়গুলিও নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক হয় না। তাই, হে মা জগৎকল্যাণকারিণী, তোমার জগৎকল্যাণের প্রথম সোপান জানিও চিত্তশুদ্ধি।

স্বাধীনই তোমাকে থাকিতে হইবে। যে পরাধীনা সে কখনও পরমকল্যাণে জীবনোৎসর্গ করিতে পারে না। কিন্তু 'পর' কাকে বলে জান মা ? কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুরাই তোমার সব চাইতে বড় 'পর' বা বড় শত্রু। এই শত্রুগুলির অধীন না হওয়াই যথার্থ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাই তোমাকে সর্ব্বাগ্রে অর্জ্জন করিতে হইবে।

পরাধীনতা আসে আত্মবিস্মৃতি হইতে। তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তোমার সম্বন্ধ কি, এই কথা যে ভুলিয়া যায়, সে-ই হয় পরাধীন। তখনই পর আসিয়া কখনও বন্ধুভাবে, কখনও বণিকভাবে, কখনও চিকিৎসক ভাবে, কখনও শিক্ষকভাবে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসে এবং লালসার লৌহ-শৃঙ্খল গলায় পরাইয়া দেয়। তারপরে যতদিন ইচ্ছা যতখানি খুসী যেমনভাবে সম্ভব বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া অঞ্জলি ভরিয়া রক্ত পান করিতে থাকে।

★ ★ ★ ★ ★

ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিকে নিবদ্ধ কর। অনুভব করিয়া দেখ, আজিকার ভারতবর্ষে নারীজাতি অবনতির কোন্ অন্ধকার-গহ্বরে পড়িয়া আছে, আর সঙ্কল্প কর, কোথায় ইহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে। নারীজাতির জীবনের সকল মলিনতা ঘুচাইয়া তাহাদের অস্তিত্বের দীপ্তিকে হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গে তুলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু ইহা সামান্য সাধনায় হইবে না। এজন্য তোমাকে প্রাণপাত করিতে হইবে, তোমার মত আরও লক্ষ লক্ষ সৎসঙ্গব্রতী মহিলাকে ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করিয়া দৃঢ়পদে দীর্ঘ পথ অফুরন্ত উৎসাহ-সহকারে চলিতে হইবে।

আজ আসি মা। মঙ্গলময় তোমাদের কল্যাণ করুন। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

(জনৈকা ব্রহ্মচারিণীর প্রতি)

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১২ই মাঘ, ১৩৩৫

নিত্যনিরাপদাসুঃ-

স্নেহের মা,★ ★ ★ সত্যের জন্যই তোমার জীবনোৎসর্গ, সত্যের জন্যই তোমার স্বার্থাহুতি, সত্যের জন্যই তোমার আত্মত্যাগ, সত্যের জন্যেই তোমার দুঃখবরণ। সত্যই তোমার জীবনের সাধনা, তোমার সাথী, তোমার জীবনের সিদ্ধি, সত্যই তোমার ধর্ম্ম, সত্যই তোমার মনুষ্যত্ব, সত্যই তোমার সর্ব্বস্ব। সত্যবিহীন অবস্থা তোমার পক্ষে মৃত্যু, সত্যবিহীন অমৃত তোমার পক্ষে হলাহল, সত্যবিহীন সুখ তোমার পক্ষে পরমদুঃখের আকর, সত্যবিহীন ভোগ তোমার নরক-যন্ত্রণা, সত্যবিহীন জ্ঞান তোমার পক্ষে মলমূত্রের গন্ধের ন্যায় অসহনীয়, সত্যবিহীন প্রেরণা তোমার পক্ষে শয়তানের দুর্ম্মতি, সত্যবিহীন সেবা তোমার পক্ষে পণ্ডশ্রম, সত্যবিহীন সদাচার তোমার পক্ষে ভণ্ডামি বা কপটতা, সত্যবিহীন তপস্যা তোমার পক্ষে মূঢ়তা, সত্যবিহীন

শান্তি তোমার পক্ষে অশান্তি।

সত্যের পথেই যখন পদার্পণ করিয়াছ মা, তখন তোমার জীবনে তপস্যারই মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিবে; সাধনারই ইন্দ্রধনু সপ্তরাগে রঞ্জিত হইয়া জীবনাকাশ শোভাদীপ্ত করিবে, জিতেন্দ্রিয়ত্বেরই পূর্ণচন্দ্র-রজনীর সুনীল নভোমণ্ডলকে হাস্যমুখরিত করিবে। কিন্তু এ পথে বাধাও প্রচুর, কণ্টকও মা অনেক, এ পথে দুর্ব্বুদ্ধির প্রতারণার অন্ত নাই, অবধি নাই। তোমার জীবনের ত্যাগধর্ম্মের দীক্ষাকে মিথ্যা যুক্তির দ্বারা, আপাত-মনোহর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা বিপথপরিচালিত করিতে কত দিক্ দিয়া কত শয়তান যে প্ররোচনার জাল জীবন ভরিয়াই রচনা করিতে চাহিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত যে রাবণ নিজের রাক্ষস-বেশ গৈরিক-রুদ্রাক্ষে লুকাইয়া জটাবল্কলে আচ্ছাদিত করিয়া, ভস্মবাঘছালে আবৃত করিয়া সতী সীতাকে তাহার কুণ্ডলী হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিবে, তাহার ঠিক নাই। জটায়ু তাহাদের দুষ্কর্ম্মে বাধা দিতে চেষ্টা করিলে তাহারা তাহাদের ষড়যন্ত্রের সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে হয়ত জটায়ুর পক্ষচ্ছেদন করিবে এবং অনায়াসে রোরুদ্যমানা সীতাকে কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিবে। যখন তুমি নীরবে নিভৃতে আপন মনে আপনভাবে জগতের হিতচিন্তায় এবং ব্রহ্মানুধ্যানে তৎপর থাকিবে, তখন হয়ত কত জয়দ্রথ পাণ্ডবগণের মৃগয়া-জনিত আশ্রমে অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া গায়ের জোরে দ্রৌপদীকে লইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিবে।

সুতরাং শুধু সত্যের পথে পদার্পণ করিলেই চলিবে না মা, সেই সত্যকে কি করিয়া কেমন ভাবে অটুট অক্ষত উচ্চশির রাখা যায়, সেই সত্যের ষোল আনা সম্মান কি করিলে বজায় থাকে, সেই দিকে তীব্র তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সীতা ত' মন্দ উদ্দেশ্যে কুণ্ডলী পার হইয়াছিলেন না, গৃহাগত তপস্বীকে ভিক্ষাদানের জন্যই, আতিথেয়তা-স্বরূপ পরমধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই ত' তিনি কুণ্ডলীর বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহার মনে এককণাও ত' অপরাধ ছিল না, কণামাত্রও ত' দুর্ব্বলতা ছিল না, তিলমাত্রও দুর্ব্বুদ্ধি ছিল না, অণুমাত্রও ত' অন্যায় ভাব ছিল না। কিন্তু মিথ্যা গৈরিক, মিথ্যা ফোঁটা-তিলক, মিথ্যা যোগীবেশ তাঁহাকে কুণ্ডলীভ্রষ্ট

করিয়া, গণ্ডীচ্যুত করিয়া রাক্ষসের কবলে নিপাতিতা করিল, তাঁহাকে সুদীর্ঘ কালের জন্য অশোকবনের কঠোর কষ্ট সহাইল, ততোধিক কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় বাধ্য করিল এবং পরিশেষে বাল্মীকির তপোবনে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণাদায়ক নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগাইল। জগতের সতীকুলের যিনি শিরোমণি, তিনি ত' ধর্ম্মবেশী অধর্ম্মের ছলনায় ভুলিয়া জীবনজোড়া দুঃখভোগ করিয়াছিলেন। এই কথা তুমি ভুলিও না মা।

পঞ্চপাণ্ডব আশ্রমে থাকিলে দুরাত্মা জয়দ্রথ দৌপদীকে জোর করিয়া নিজ রথে তুলিতে পারিত না, – পাণ্ডববর্গের উপস্থিতির অভাবই তাহাকে এই দুষ্কর্ম্ম করিবার বল দিয়াছিল। পাণ্ডবেরা গৃহে থাকিলে পাদুকার আঘাত শিরে সহিয়া তাহাকে ফিরিতে হইত। দ্রৌপদীর অঞ্চলের কোণ সে নরাধম স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইত না। আবার পাণ্ডবেরা যখন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, দ্রৌপদী নাই, তখন তাঁহারা কি যে অমিতপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, জয়দ্রথকে পঞ্চপাণ্ডবের পায়ে ধরিয়া "দাস হইলাম" বলিয়া নাকে খত দেওয়াইলেন, সে কথাও ভুলিও না।

সীতার যেমন আত্মরক্ষার কুণ্ডলী ছিল, তোমারও তেমন কুণ্ডলী আছে। দ্রৌপদীর যেমন সতীত্ব-সহায় পঞ্চপাণ্ডব ছিলেন, তোমারও তেমন পঞ্চপাণ্ডব আছেন। এই কুণ্ডলী কি এবং পঞ্চপাণ্ডব কে, তাহা তোমাকে প্রজ্ঞাদৃষ্টির বলে জানিতে হইবে এবং রাবণের ন্যায় ধর্ম্মধ্বজী রাক্ষসের কৌশল-জাল হইতে, জয়দ্রথের ন্যায় কামুক পিশাচের নির্য্যাতন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। তোমাকে দেখিতে হইবে, যজ্ঞীয় হবিঃ না কামকুক্কুরের উপভোগ্য হয়, চন্দনের বাটিতে না বিষ্ঠার কৃমিরা আসিয়া সাঁতার কাটে। তোমাকে দেখিতে হইবে, যূথিকার মাল্য না তুষানলে দগ্ধ হয়, দীর্ঘসঞ্চিত সংযমের মধুভাণ্ড না মদ্যপায়ীর রসনা তৃপ্ত করে। তোমাকে দেখিতে হইবে, শৃগাল না মৃত জন্তুর পর্য্যুসিত মাংসখণ্ড লইয়া ব্যাঘ্রিনীর গিরিবিবরে প্রবেশ করে, শূকর না গজরাজ-নিষেবিত কমল-কাননে পঙ্ক উৎসেচিত করিয়া গাত্রকণ্ডূয়ন নিবারিত করে। তোমাকে দেখিতে হইবে, কীট না অধরদংশনে পারিজাতপুষ্পকে অপবিত্র করে, শকুনি না গোমাংসলোলুপ লইয়া দেবতার

নৈবেদ্যের উপরে আপতিত হয়। তোমাকে দেখিতে হইবে, কাজ গুছাইবার রজ্জু না কালসর্প হইয়া হলাহল উদ্গিরণ করে, লজ্জা ঢাকিবার বস্ত্র না বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মৃত্যুলজ্জায় দণ্ডিত করে। তোমাকে দেখিতে হইবে, ধর্ম্মদাতা না তোমাকে অধর্ম্মের গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করে, বুদ্ধিদাতা না তোমাকে দুর্ব্বুদ্ধির গহন বনে টানিয়া নেয়, সাহায্যদাতা না তোমাকে অসহায়া ও অনাথা করিয়া চিরদুঃখের গুরুভার-পসরা মাথায় চাপাইয়া দেয়। ধর্ম্মের নামে বহু শত বৎসর ধরিয়া পুরুষজাতি অনেক অকাণ্ড-কুকাণ্ড করিয়াছে, অনেক নির্ভরশীলা নিষ্পাপ হৃদয়া অবলার পবিত্রতার অপমান করিয়াছে, লতাসাধন, কুমারীপূজা, সহজোলি, অমরোলি, বজ্রোলি প্রভৃতি মুদ্রাসাধন, ঊর্দ্ধরেতা-সাধন, সহজসাধন, ভৈরবীচক্র, যোগিনীচক্র প্রভৃতি নানা নাম দিয়া নানা অসামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যপদেশে ধর্ম্মার্থিনী রমণীসমাজকে অধর্ম্মের চূড়ান্ত দুর্ভোগ ভোগাইয়াছে, মাতৃজাতির মাতৃত্বের মুখে কলঙ্কের চরম কালিমা লেপন করিয়াছে, মোক্ষাভিলাষিণীর মোক্ষকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া চিরদুঃখের সহিত যম-বন্ধন বাঁধিয়াছে, সতীর সতীত্ব কাড়িয়া নিয়াছে, ধার্ম্মিকার ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দেওয়াইয়াছে, সাধিকার সাধনের ধন খোয়াইতে বাধ্য করিয়াছে, তপস্বিনীর তপস্যার পরশমণি সুদূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। আজও কত ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মপ্রচারক, ধর্ম্মসাধক কামরূপ-কামাখ্যার পূজাপীঠের বুকে দাঁড়াইয়া, কাশী–বিশ্বেশ্বরের মন্দিরছায়ায় বসিয়া, বৃন্দাবন-বিহারীর নিত্যার্চ্চনার বেদীর উপরে আসন বিছাইয়া, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গের সূতিকাগৃহের মধ্যখানে আড্ডা গাড়িয়া ধর্ম্মের নামে ঘোরতর ব্যভিচারের প্লাবন প্রবাহ বহাইতেছে। আজও গ্রামে গ্রামে কুটীরে কুটীরে নৈশ-অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া কত নরনারীর বারোয়ারী সাধন-বৈঠক বসে, কতই না ধর্ম্মের আলোচনা হয়, কতই না দিব্যানন্দের আস্বাদন হয়, কতই না ভজন-পূজনের অনুশীলন হয়, কতই না কৃষ্ণভক্তি, কতই না তন্ত্রভক্তি, কতই না গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। আজও কত ধার্ম্মিক সমগ্র দিন পরের অনিষ্ট করিয়া, পরকে ঠকাইয়া, মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায় নিরপরাধ নিরীহ প্রতিবেশীকে জেরবার

করিয়া, প্রাণসম বন্ধুর সহিত তুচ্ছ-স্বার্থ-লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, আসন্ন-প্রসবা পত্নীর গর্ভস্থ সন্তানকে পদাঘাতে কুক্ষিভ্রষ্ট করিয়া সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই কারণপানে সহসা নিরতিশয় কালীভক্ত বনিয়া যাইয়া 'মা-মা' রবে দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া মহিষবৎ চীৎকার করিতেছে, আর সমগ্র রজনী তপস্বিনী নামধারিণী গৈরিক বেশের কলঙ্ককারিণী নীচবুদ্ধি ও নীচমনা কুলটা রমণীর সহিত শিবশক্তির অনুকরণ করিবার স্থূল প্রয়াস পাইতেছে। শত সহস্র শিষ্য-শিষ্যার ভবপারের কত কাণ্ডারী আজও মা ঘৃণিত ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের পূতিগন্ধময়ী উদ্দীপনা জাগাইয়া পুরুষ ও স্ত্রীভক্তগণের স্বেচ্ছাচারের কালকূটে গৃহে দাবাগ্নি জ্বালাইয়া যাইতেছে। মুখে যার যত বেশী করিয়া কৃষ্ণকথা, কুলকামিনীর সেই তত বেশী সর্ব্বনাশ করিতেছে। মুখে যার যত বেশী "মা-মা" রব, সেই তত বেশী করিয়া মাতৃজাতির শিরে অপব্যবহারের বিষ্ঠাকুণ্ড ঢালিয়া দিতে তৎপর রহিয়াছে। ভাগবতের শ্লোক যার যত বেশী মুখস্থ, সে তত বেশী করিয়া পাপানুসরণ করিতেছে। তন্ত্রের "হুংফট্"-এ যার যত অধিকার, তার ভিতরেই তত অধিক গলদের থানা গাড়া হইয়াছে।

কিন্তু এত করিয়া বলিয়াও মা আমি আমাদের এই পুরুষজাতির, এই ধর্ম্মগুরু-সম্প্রদায়ের নীচতার ও কুটিলতার বীভৎস চিত্রের সহস্রাংশের একাংশও বর্ণনা করিতে পারি নাই। তাই মা, তোমাকে বারংবার বলিতেছি, জীবন ত' যাপন করিতে যাইতেছ বিরাট ও মহান্, ব্রত ত' গ্রহণ করিয়াছ নভঃস্পর্শী ও অমৃতত্বের, দীক্ষা ত' তোমার চিরমঙ্গলের ও চির-সত্যময়ী, কিন্তু মা সীতার কুণ্ডলী ছাড়িলে চলিবে না, পঞ্চপাণ্ডব হইতে দূরে একাকিনী অবস্থান করিলে চলিবে না, তোমাকে সর্ব্বাবস্থাতে নিজের কুণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে হইবে, পঞ্চপাণ্ডব যদি আশ্রম ছাড়িয়া মৃগয়ায় বাহির হন, তবে তোমাকেও তাঁহাদের সহিত মৃগয়া-সঙ্গিনী হইতে হইবে

তোমার পক্ষে সীতার কুণ্ডলী হইতেছে তোমার দেহের পবিত্রতা। ধর্ম্মের জন্যও তুমি এই কুণ্ডলী লঙ্ঘন করিবে না, মুক্তির জন্যও তুমি তোমার দেহের উপরে অপরের স্পর্শকে আসিতে দিবে না। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ,

মহাভারত, গীতা, তন্ত্র বা ভাগবতের শ্লোক যদি খইএর মতনও ফুটিতে থাকে, তথাপি তুমি সীতার এই কুণ্ডলী অতিক্রম করিবে না। মনে রাখিতে হইবে, জয়দ্রথের হাতে পড়িলে হয়ত বা তখন তখনই মুক্তির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু রাবণের হাতে পড়িলে আর মৃত্যুর পূর্ব্বে নিষ্কৃতি নাই। মনে রাখিও, বল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিপথ-গামিনী হইলে তবু বা ললাটের লেখা ভাল থাকিলে উদ্ধারের অতি ক্ষীণতম একটুকু আশা হয়ত বা থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে বিপথচারিণী হইলে তার আর ইহজীবনে বা পরজীবনে কখনও কোনও ক্রমে অব্যাহতি নাই।

তোমার পক্ষে পঞ্চপাণ্ডব হইতেছে তোমার উদারতা, বাহুবল, একাগ্রতা, সাহস ও উৎসাহ। প্রলোভন যদি সম্মুখে আসিয়া ছলাকলা বিস্তার করিতে চেষ্টা করে, তবে তোমাকে হইতে হইবে যুধিষ্ঠিরের মত স্থিরবুদ্ধি, সহসা তুমি তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিবে না, প্রথম ডাকেই তুমি ইন্দ্রিয়ের পূজায় নিজেকে বলি দিবে না, চঞ্চল হইয়া, অধীর হইয়া ফাঁসীর দড়ি গলায় পরিবে না, কাল অপেক্ষা করিবে, কৌরবকুলের উৎপীড়নে উত্তেজিত হইয়া সত্যপথ বা ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইবে না। অত্যাচারীর পশুশক্তি যদি তোমাকে অভিভূত করিতে চাহে, তুমি এক কথায় তার কাছে নতিস্বীকার করিবে না। নারীজাতি অবলা বলিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া থাকিলেও তুমি তোমার বাহুবলের নিপুণ প্রয়োগে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরাঙ্মুখ হইবে না, তুমি তোমার শাণিত কৃপাণ দুর্ব্বত্তের বুকে বসাইয়া ভীমেরই মত একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদীর কটিতটের বস্ত্র-আকর্ষণকারী দুঃশাসনের রক্তপান করিতে কুণ্ঠিতা হইবে না। তুমি তোমার রণভয়ঙ্করা উন্মাদিনী মূর্ত্তির বিকট উল্লাসে ত্রিভুবন প্রকম্পিত করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না, কুদৃষ্টি শনিঠাকুর বিঘ্ননাশন গণেশঠাকুরের বেশ পরিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই তাহার নামাবলীর আর চৈতন্যের খাতির করিবে না। পরন্তু কাণটী কাটিয়া দিয়া তবে তাহাকে ছাড়িবে। দ্রোণাচার্য্য যখন শিষ্যবর্গের একাগ্রতা পরীক্ষার জন্য একটী পক্ষী নির্ম্মাণ করিয়া বৃক্ষোপরি রাখিয়াছিলেন এবং শিষ্যবর্গকে উহা লক্ষ্য করিতে

বলিয়াছিলেন, তখন যেমন অর্জ্জুন পক্ষীর শুধু মস্তকটুকুই দেখিতে পাইয়াছিলেন, আর কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না, ঠিক তেমনি যখনি তুমি যেমন অবস্থার মধ্যে থাক না কেন, পিতৃগৃহে সদাচার-শিক্ষার্থিনী কন্যারূপে, শিক্ষাশ্রমে বিদ্যার্জ্জন—পরায়ণা ছাত্রীরূপে, গুরুগৃহে সাধনরহস্য-জিজ্ঞাসু শিষ্যারূপে, বন্ধুগৃহে স্নেহ-ভালবাসা-লিপ্সু আপনার জনরূপে, তীর্থস্থানে ধর্ম্মরস-পিপাসু ভক্তরূপে, দেশসেবায় জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রচারিকা গুরুরূপে বা অন্যত্র যে কোনও স্থানে বা কার্য্যে যখন যেরূপেই থাক না কেন, অর্জ্জুনের মত তোমাকে জীবনের লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রদৃষ্টিশীলা থাকিতে হইবে। আর তোমাকে থাকিতে হইবে নকুলের মত ঘোরতর সংগ্রামেও মৃত্যুহীন-সাহস-পরায়ণা ও দীর্ঘব্যাপী রণোন্মাদনায়ও সহদেবের মত অফুরন্ত উৎসাহশালিনী।

সীতার এই কুণ্ডলী আর এই পঞ্চপাণ্ডব যদি না তোমার স্মৃতিপথ হইতে বিচ্যুত হয়, তবে তোমার জীবনের গৌরব অপহরণ করিবার সামর্থ্য কোন্ পাপিষ্ঠের হইবে ? চিরদুর্ভাগ্যক্লিষ্টা ভারতজননী রাহু-গ্রাসে পাপকালিমাগ্রস্তা হইয়া নিয়ত যে অসহনীয় দুঃখতাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন, তোমরা যদি মা জীবনের গৌরবকে কি ধর্ম্ম-সাধনায়, কি কর্ম্মসাধনায়, কি আত্মমোক্ষের অনুসরণে, কি পরমোক্ষের অনুশীলনে, কি আত্মত্রাণে, কি আর্ত্তত্রাণে, এমনি পবিত্র, এমনি প্রস্ফুটিত, এমনি অনাঘ্রাত রাখিতে পার, তাহা হইলে দেশজননীর সেই অকথনীয় দুর্গতি ঘুচিতে কয় কটাক্ষ লাগে মা ?

শুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ

(১৩)

(জনৈকা ব্রহ্মচারিণীর প্রতি)

হরি ওঁ — পুপুন্‌কী আশ্রম

১৫ই মাঘ, ১৩৩৫

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

স্নেহের মা, ★ ★ ★ তোমার কর্ম্মজীবনের প্রধানতম ক্ষেত্র হইবে গৃহীর সংসার এবং সমাজ। নিজের জীবন সকল সংসারীর আবর্ত্ত ও পঙ্কিলতার

বাহিরে রাখিয়াও সংসারী মানবকেই তপস্তেজঃপূর্ণ দিব্য জীবনের সন্ধান বলিতে হইবে। আবার, নিজে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিলেও সমাজের মানবের জন্যই আত্মবলি দিতে হইবে।

তোমাকে করিতে হইবে, বর্ত্তমান সমাজ ও বর্ত্তমান সংসারের আমূল সংস্কার।বর্ত্তমান অবস্থার আপাদমস্তক নূতনত্বের বিভায় দীপ্ত করিতে হইবে, জীর্ণ জরাগ্রস্ত রামপালের গজারিগাছের গোড়া হইতে তপস্বী ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদপূত পুষ্পমাল্যের শক্তিতে নূতন নূতন মৃত্যুজয়ী অঙ্কুর সৃষ্টি করিতে হইবে। সাগরপারের সভ্যতার অনুকরণে নহে, পাশ্চাত্য ভাবের অনুপ্রাণনায় নহে, পরপ্রভাবপুষ্ট জনমতের মাদকতায় আচ্ছন্ন হইয়া নহে, পরন্তু ভারতীয় সভ্যতার যাহা মজ্জস্নেহ, যাহা নির্য্যাস, তাহার সহিত নিগূঢ়-ভাবে পরিচয় লাভ করিয়া, ভারতের কোটি কোটি নরনারীর প্রাণের সুখদুঃখের প্রকৃত স্বরূপ নিজ চক্ষে দর্শন করিয়া, আমাজন-টেমসের সলিলপ্রবাহের সহিত জাহ্নবী-যমুনার সলিলপ্রবাহের তুলনা করিয়া, তারপরে তোমাকে সংস্কারকর্ম্মে হাত দিতে হইবে। দেশ এবং দেশবাসীকে আগে কায়মনোবাক্যে ভালবাসিয়া লইতে হইবে, তারপরে তুমি নবযুগের নূতন সৃষ্টিতে হস্তার্পণ করিবে।

তোমরা মা, নবযুগের বিশ্বামিত্র। নূতন স্বর্গ সৃষ্টির শক্তি ও অধিকার ত' মা তোমাদেরই। কিন্তু তপস্যার মহিমাতে সেই শক্তিকে নিজের অন্তরে অনুভব করিতে হইবে, দীর্ঘসাধনালব্ধ বহুকৃচ্ছ্রপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ্যের প্রভাবে সেই অধিকারের আহ্বান-গর্জ্জন অন্তরাত্মা হইতে শুনিতে হইবে। ইতি-

নিত্যাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

(জনৈকা ব্রহ্মচারিণীর প্রতি)

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

২১শে মাঘ, ১৩৩৫

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

স্নেহের মা,★ ★ ★ এই অধঃপতিত জাতির বালিকাদিগের মধ্যেই

তোমাকে যাইয়া জ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে দাঁড়াইতে হইবে। অন্ধতমসাচ্ছন্ন নারীজাতির অভ্যুদয়-মানসে তোমাকে গিয়া ইঁহাদেরই মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে- বন-শেফালীর বর্ষার মত অকাতরে এবং পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত সানন্দে। তোমাকে ইহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান শিক্ষা দিতে হইবে সংযমের, পবিত্রতার, চরিত্রের ও সতীত্বের।

স্ত্রীজাতিকে ক-খ-গ-ঘ শিখাইবার ব্যবস্থা দেশমধ্যে হউক আর না হউক, তাহাকে তাহার নিজস্ব পবিত্রতা, নিজস্ব মহিমা ও নিজস্ব শক্তির জ্ঞানে সুদীক্ষিতা করিবার প্রয়োজন আগে। ক-খ শিখাইতে পারিলে, লেখাপড়ার চর্চ্চা ঘটাইতে পারিলে নারীকে তাহার স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার শ্রম সহজে সফল হইবে বলিয়া ইহারও প্রসারকল্পে তোমাকে তোমার যথাসম্ভব সামর্থ্য বিনিয়োজিত করিতে হইবে। কিন্তু তোমার প্রধানতম লক্ষ্য হইবে চারিত্র্য-গৌরবের প্রতিষ্ঠা, পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা, চিত্তসংযম ও আত্মশুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। ইংরেজী পদ্ধতির স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে এই জিনিষগুলি নাই, এই জন্যই আমি পাশ্চাত্য প্রণালীর স্ত্রীশিক্ষাকে ভারতের মুক্তির সোপান বলিয়া মনে করিতে পারি নাই, আদরের সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই।

তোমাকে মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার প্রকৃত রহস্য পুস্তক-পরিচয়ে নহে, পরন্তু সুদৃঢ়, অনমনীয়, অকুতোভয়, বজ্র-কঠোর, তেজোদীপ্ত, শৌর্য্যশালী সুষ্ঠু চরিত্র-গঠনে। শিক্ষার উদ্দেশ্য কতকগুলি তোতাপাখী সৃষ্টি করা নহে। পরন্তু বীর্য্যশালী, ব্যক্তিত্বশালী, চারিত্র্য-প্রতিভায় সমৃদ্ধিশালী, আত্মমর্য্যাদাবুদ্ধিপ্রবুদ্ধ নরনারী সৃষ্টি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহাতেই শিক্ষার পূর্ণ সার্থকতা। পুস্তক তুমি পড়াইবে কিন্তু তাহা হইবে তোমার গৌণ কর্ত্তব্য। তাহাদের প্রাণের ভিতরে চরিত্রের মহিমাকে তুমি জাগ্রত করিবে, ইহাই হইল তোমার মুখ্য কর্ত্তব্য। তোমার কর্ত্তব্য হইবে নারীকে সেই অপরিসীম ক্ষমতায় ক্ষমতাবতী করিয়া তোলা, যার বলে মৃত্যুলুব্ধ পতঙ্গের রমণীয় রূপানলে দহিয়া মরিবার উন্মত্ত আবেগকে সে কটাক্ষের ইঙ্গিতে নিঃস্তব্ধ করিয়া দিতে পারে। তোমার কর্ত্তব্য হইবে নারীকে সেই অসামান্য শিক্ষায় সুশিক্ষিতা করিয়া তোলা, স্বপ্নকুহকাকৃষ্ট কামাতুর পুরুষের

আত্মচৈতন্য যাহার প্রভাবে তেজোময়ী নারীর বাম চরণের একটী অঙ্গুলি হেলনে নিমেষমধ্যে ফিরিয়া আসে, লক্ষ ভুজঙ্গমের যুগপৎ দংশনে চমকিত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট চ্যুতমঙ্গল পুরুষ-জীবনের অধোমুখিনী তামসিকী গতি যাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারে। তোমার কর্ত্তব্য হইবে নারীকে সেই অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারিণী করিয়া গড়িয়া তোলা, যাহার প্রভাবে ম্লানমুখী বিষাদ-বিধুরা অবলা নারী আহ্লাদময়ী আনন্দমুখরা সবলা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। চিরনিন্দিতা লালসার দাসী যশঃসৌভাগ্যসম্বর্দ্ধিতা তপস্তেজঃপ্রদীপ্তা মহীয়সী মূর্ত্তি ধারণ করে, মোহমদিরায় আত্মহারা পতনলোভাতুরা কামকিঙ্করী রমণী দিব্যশৌর্য্য-বিভূষিতা খর্পরকরবাল-মণ্ডিতা অসুরনিহন্ত্রী মহিষমর্দ্দিনীরূপে দেখা যায়। তোমার কর্ত্তব্য হইবে নারীকে সেই কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে উদ্বোধিতা করিয়া তোলা, যাহাতে পুরুষের কামনার অনলে ইন্ধন যোগাইতে অস্বীকৃতা হইয়া নারী তাহাকে দিব্য জীবনের পথে প্রবর্ত্তনা দিবে, যাহাতে নিজ রূপ-যৌবনকে পণ্যরূপে ব্যবহার করিতে অস্বীকৃত হইয়া নারী পুরুষকে অনন্ত-যৌবনের সাধনায় উৎসাহিত করিবে, যাহাতে পুরুষের দেহ-মন লইয়া ভোগবিলাসের বানরীবৃত্তি বর্জ্জন করিয়া নারী পুরুষের মহাশক্তিরূপে ধরাবক্ষে দেদীপ্যমানা রহিবে।

মদিরা যেমন মানুষকে প্রমত্ত ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে, নারীও যদি পুরুষকে তেমনই করে, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সেই নিন্দিতা নারীর স্থান নাই। অনলশিখা যেমন করিয়া মহারণ্যকে দগ্ধ করে, নারীও যদি পুরুষকে লালসার অনলে তেমনই করে, তবে নবযুগের রমণী-সমাজে সে নরঘাতিনী নারীর স্থান নাই। অহিফেন যেমন মানুষের জ্ঞান হরণ করে, নারীও যদি তেমনই পুরুষের জ্ঞানহরণেই নিরত থাকে, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সে মোহময়ী নারীর স্থান নাই। বিষলতা যেমন করিয়া মহামহীরুহের আপাদমস্তক পুষ্পিতা বল্লরী দিয়া ছাইয়া ফেলে এবং পরিশেষে তাহাকে মৃত্যুদশায় নিপাতিত করিয়া নিজেও মৃত্যুর কবলিত হয়, নারীও যদি পুরুষের প্রতি তেমনই করে, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সে কৃতান্তদূতী নারীর স্থান নাই। চোর যেমন নিশাযোগে

নির্ভরনিদ্রাসুখ গৃহস্থের লৌহপেটিকায় সুরক্ষিত যাবতীয় ধনরত্ন অজ্ঞাতসারে অপহরণ করে, নারী যদি তেমনই করিয়া পুরুষের সর্ব্বস্ব হরণ করে, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সে সর্ব্বনাশিনী নারীর স্থান নাই। ক্ষুধার্ত্তা ব্যাঘ্রী যেমন করিয়া মৃগকিশোরের দেহমাংস পরমানন্দে চর্ব্বণ করিয়া কৃতার্থ হয়, নারীও যদি তেমনই করিয়া পুরুষের মাংস চিবাইয়া খায়, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সে রাক্ষসী নারীর স্থান নাই। মরুমরীচিকা যেমন আশা-প্রলুব্ধ পথিককে প্রবঞ্চিত করিয়া মৃত্যুময় দুঃখে নির্য্যাতিত করে, তৃষ্ণার্ত্তা নারীও যদি পুরুষকে তেমনই করে, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সে অকল্যাণময়ী নারীর স্থান নাই। ব্যাধ যেমন বাঁশী বাজাইয়া সাপ ধরে এবং বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া চিরতরে তাহাকে বীর্য্যহীন করিয়া রাখিয়া দেয়, নারী যদি পুরুষকে তেমন ক্লীব, তেমনি মেরুদণ্ডহীন, তেমনি তেজোবঞ্চিত করে, তবে জানিও মা, নবযুগের নারী-সমাজ তাহাকে চাহে না।

এই জন্যই তোমাকে তোমার ছাত্রী-সমাজে সর্ব্বপ্রথমেই যাইয়া দিতে হইবে সেই সাধনা, যাহা প্রত্যেক বালিকাকে নিজের প্রলোভন-জনয়িত্রী শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে সামর্থ্য দিবে। পুরুষকে রূপমুগ্ধ করিবার ক্ষমতা নারীর আছে কিন্তু পুরুষ যাহাতে তাহার রূপের মোহে আত্মহারা হইয়া দীর্ঘপথ-গমনোদ্যত স্বীয় চরণমূলে কুঠারাঘাত না করে, আজন্মপুষ্ট মহদাকাঙ্ক্ষার শিরে বজ্রাঘাত না করে, মহনীয় কর্ত্তব্যের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া লালসার কূপে ডুবিরা না মরে, তার জন্য আজ নারীকে নিজ রূপ-বিভূতি সম্বরণ করিতে হইবে। পুরুষকে ভালবাসা দিয়া জয় করিবার ক্ষমতা নারীর আছে, কিন্তু পুরুষ যাহাতে নারীপ্রেমের কুটিল আবর্ত্তে পড়িয়া জীবনের সুমহৎ ব্রতনিচয়ে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য না হয়, তার জন্য নিজ ভালবাসাকে নিজের ভিতরে লুকাইয়া রাখিবার সামর্থ্য নারীকে অর্জ্জন করিতে হইবে। পুরুষকে আনুগত্য দ্বারা বাধ্য করিবার ক্ষমতা নারীর আছে কিন্তু পুরুষ যাহাতে নারীর আনুগত্যের জালে জড়াইয়া মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হইয়া পড়ে, তার জন্য নিজের আনুগত্যকে সকল অকল্যাণের সম্ভাবনা হইতে অব্যাহত রাখিয়া চলিবার যোগ্যতা নারীকে অর্জ্জন করিতে

হইবে। যাহারা ইহা করিতে পারিবে, তাহারাই নবযুগের নারী। নবযুগের নারীর সর্ব্ব বিষয়ে ষোল আনা স্বাধীনতা থাকিবে কিন্তু পুরুষের সংযমকে কখনও সে অজ্ঞাতসারেও বিচলিত করিবে না। যে কথা বলিলে পুরুষের চিত্তে কামনার হলাহল বিষক্রিয়া বিস্তার করিতে পারে, সে তাহা বলিবে না; যে ভাবে চলিলে পুরুষের মনের সুপ্ত লালসা উন্মত্ত আক্রোশে গর্জ্জিয়া উঠিতে পারে, সে ভাবে সে চলিবে না। যে রূপটী ধরিয়া সুমুখে দাঁড়াইলে পুরুষের নয়ন কামের-মদিরাবেশে বিভোর হইতে পারে, সে রূপ সে ধরিবে না। যে ভাবে সহযোগিতা দান করিলে পুরুষের মনে ভোগের ক্ষুধা, সুখের তৃষ্ণা সহজেই জাগিয়া উঠিতে পারে, সে ভাবে সে কখনও কোনও পুরুষের সহযোগিনী হইবে না।

পুরুষের সংযমের প্রতি এইরূপ সদা-সতর্ক সাবধান-দৃষ্টি—অদূর-ভবিষ্যতের নারী-সমাজকে তেজোবীর্য্য-গরীয়ান্ মহাজাতি সৃষ্টির মহনীয় অধিকার দান করিবে। স্ত্রীলোকের সতীত্বকে যাবতীয় সত্যাশ্রয়ী পুরুষ যেমন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পুরুষের সংযমকে নারীজাতি যেদিন সেরূপ সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিবে, সেইদিনই ভারতবর্ষের প্রকৃত গৌরবের পুণ্যময় দিন সমাগত হইবে। নারীর সতীত্বনাশের সহায়তা করিলে নির্ব্বংশ হইবে বলিয়া পুরুষজাতি যেমন বদ্ধমূল সংস্কার গড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, পুরুষের সংযমনাশে সহায়তা করিলেও তেমনি জন্মে জন্মে ক্লেশ-ভোগ করিতে হইবে বলিয়া নারী যখন সুদৃঢ় সংস্কার গড়িয়া লইতে পারিবে, সেইদিনই ভারতের নবযুগের শুভ অরুণোদয় আরম্ভ হইবে। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিজয়-ভেরী বাদিত হউক, আমরা তাহার তালে তাল দিব, কিন্তু স্বাধীনা নারীরা যেন বুদ্ধের সুতীব্র তপস্যায়, শঙ্করের বিদ্যুন্নিন্দী তেজে, চৈতন্যের আত্মভোলা প্রেমে উদ্বুদ্ধা হইয়া নারীজাতির সহিত পুরুষ-জাতিকেও চিত্তসংযমের, আত্মদমনের, মদনভস্মের ক্ষমতা দান করে।

★ ★ ★ ★ ★

অত্র কুশল। তোমাদের কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

(জনৈকা ব্রহ্মচারিণীর প্রতি)

হরি-ওঁ   পুপুন্‌কী আশ্রম

২৫শে মাঘ, ১৩৩৫

নিত্যনিরাপদাসুঃ-

স্নেহের মা,★ ★ ★ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টীকে শাস্ত্রকারগণ রিপু বা শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক শুধু এই ছয়টীই যে জীবনের উন্নতির শত্রু, তাহা নহে। শত্রু আরও শত শত আছে, সহস্র সহস্র আছে, কিন্তু এই ছয়টী শত্রুকে যে পদতলে পিষিয়া মারিতে পারে, অপরাপর শত্রু হইতে তাহার আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না। সেনাপতি এবং সহকারী সেনাপতিদিগকে গতাসু করিতে পারিলে যেমন অক্ষৌহিণী-পরিমিত বিপক্ষ সৈন্যকেও অনায়াসে বা অল্পায়াসে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া যায়, তেমনি কামক্রোধাদি প্রধান শত্রুদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিলে অপরাপর শত্রুগুলি সহজেই পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

কাম হইল রিপুচয়ের প্রধান সেনাপতি। অপর সকল রিপুকে ধ্বংস করিলেও এই প্রধান সেনাপতিটি যদি অক্ষত শরীরে থাকিতে পারে, তাহা হইলে নূতন করিয়া রণ-বাহিনী সৃষ্টি করিয়া লইবে। কটাক্ষের ইঙ্গিতে কাম ক্রোধকে উদ্দীপিত করিবে, লোভকে প্ররোচিত করিবে, মোহের ঘনান্ধকার সৃষ্টি করিবে, নানা অশান্তিজনক ও অকল্যাণকর মিথ্যার জন্মদান করিয়া সে রক্তবীজের গোষ্ঠীর ন্যায় হৃদয়মধ্যস্থ সদ্ভাবরূপী দেবগণকে পীড়িত ও স্বর্গভ্রষ্ট করিবে। তাই, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রিপুরাজ কামকেই মর্দ্দন করিতে হয়।

কাম কথাটীর শব্দার্থ কামনা। কামনা মানে ইচ্ছা। কিন্তু ইচ্ছা মাত্রেই কাম নহে। পরসুখের ইচ্ছাও কামনা, দেবসেবার ইচ্ছাও কামনা, কিন্তু তাহারা কাম নহে। একজন ক্ষুধায় মরিতেছে, তোমার ইচ্ছা হইল তাহাকে নিজের মুখের গ্রাস দান করিবার, ইহা তোমার মনের একটী কামনা, কিন্তু ইহা কাম নহে। একজন স্বদেশ-প্রেমিকের রোমাঞ্চকর অত্যদ্ভুত জীবন-কাহিনী শুনিলে, আর তাঁহারই মত স্বদেশের জন্য স্বজাতির জন্য জীবন

উৎসর্গ করিবার জন্য ইচ্ছা জন্মিল, ইহাও মনের একটি কামনা, কিন্তু ইহা কাম নহে। কোনও ভগবদ্দর্শী মহাপুরুষের অযাচিত কৃপা তোমার জীবনের উপরে আসিয়া পড়িল, তিনি যেমন অযাচিত-ভাবে লোক-কল্যাণ-সাধন করিতেছেন, তোমারও তেমনি করিতে ইচ্ছা জন্মিল, তিনি যেমন তাঁহার পুণ্যময় সংসর্গের অন্তর্ভেদী প্রভাবের দ্বারা পাপীর পাপ, তাপীর তাপ, দুঃখীর দুঃখ, ব্যথিতের ব্যথা বিদূরিত করেন, তিনি যেমন তাঁহার প্রাণভরা ভালবাসার শক্তিতে নিরাশের নৈরাশ্য, উদাসীনের ঔদাস্য, অলসের আলস্য বিনাশ করেন, তোমারও তেমন করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি যেমন কথার চাইতে মনের শক্তিতেই সমাজের বেশী কল্যাণ করেন, তিনি যেমন প্রকাশ্য ভাবের চাইতে অপ্রকাশ্য ভাবেই মানবজাতির বেশী সেবা করেন, তোমারও তেমনি করিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মিল,–ইহা তোমার কামনা, কিন্তু কাম নহে। কামনা ভালমন্দ উভয় প্রকারই হইতে পারে কিন্তু কাম শুধু নীচের দিকেই টানে, পতনের পানেই আকর্ষণ করে। কাম চিত্তের অতি নিকৃষ্ট কামনা।

কিন্তু সকল নিকৃষ্ট কামনাই কি কাম ? না, তাহা নহে। একজন তোমার অনিষ্ট করিয়াছে, তুমি তাহার এই আচরণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছ এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য একান্তই ইচ্ছুক হইয়াছ। তোমার এই ইচ্ছাটী একটী নিকৃষ্ট কামনা। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে কাম বলিব না, ইহার নাম ক্রোধ। হয়ত কাহারও একটী সুদৃশ্য ও মূল্যবান্ রত্নালঙ্কার দেখিতে পাইয়াছ, ইহা পাইবার তোমার ইচ্ছা জন্মিল, অথবা একথালা সন্দেশ দেখিয়াছ, ক্ষুধা পায় নাই, তবু তোমার খাইবার স্পৃহা জন্মিল, ইহাও একটী নিকৃষ্ট কামনা, কিন্তু ইহা কাম নহে, ইহা লোভ। একজন হয়ত আপ্রাণ পরিশ্রমের দ্বারা প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তোমার ইচ্ছা হইতে লাগিল যেন এই লোকটী তোমারই ন্যায় নির্ধন বা তোমা অপেক্ষাও দরিদ্র হইয়া যান, চোরে যেন তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করে, দস্যুতে যেন তাঁহার সকল ধনরত্ন কাড়িয়া লইয়া যায়,– একজন তাঁহার পুত্রগণকে কত ক্লেশ সহ্য করিবার পরে লেখাপড়ায় কৃতী করিয়া তুলিয়াছেন, তোমার হয়ত ইচ্ছা জন্মিল, ইহারা আর বাঁচিয়া না থাকুক,

অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া তাহাদের পিতামাতার সন্তান-সৌভাগ্যের কপালে আগুন ধরাইয়া দেউক,–একজন হয়ত সমগ্র জীবনব্যাপী সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার বলে দেশমধ্যে মহাত্মা বলিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তোমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, এই মহাপুরুষেরও চরিত্রের বিরুদ্ধে দুই চারিটা গ্লানিজনক কলঙ্ককথা আবিষ্কৃত হউক, একজন হয়ত বাগ্মিতায় বা কবিত্ব প্রতিভায় পৃথিবীময় পূজা লাভ করিয়াছেন, তোমার ইচ্ছা হইতে লাগিল যেন লোকে তাঁহাকে সাধারণ লোকের চাইতে বেশী বড় বলিয়া মনে না করে, শতমুখে তাঁহার প্রশংসা-গুঞ্জন না করে,-তোমার এইরূপ ইচ্ছাও নিকৃষ্ট কামনাই বটে, কিন্তু ইহা কাম নহে, ইহার নাম মাৎসর্য্য।

নিকৃষ্ট কামনাগুলিরও শ্রেণীভেদ আছে। কতকগুলি কামনা মনকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সুখসম্পাদনের জন্য আকুল, অধীর ও পাগল করিয়া তোলে। ঐ সকল কামনার মধ্যে অধিকাংশই কাম। চক্ষু যাহা দর্শন করিতে চাহিলে বিবেকের বাণী ভিতর হইতে নিষেধ জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা করে, জানিবে, সেইরূপ দৃশ্য দর্শন করিবার ইচ্ছা অধিকাংশ সময়ে কামেরই কার্য্য। যেরূপ বাক্য শ্রবণ করিতে চাহিলে নিজের সদাচারের সংস্কার আহত হয়, সু-রুচিতে আঘাত লাগে, অন্তরে ঘৃণামিশ্র লজ্জার উদয় হয়, জানিবে, সেইরূপ বাক্য শ্রবণের কামনা অধিকাংশ সময়ে কামেরই কার্য্য। যেরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে জিহ্বা নিজেকে অপবিত্র হইবার আশঙ্কায় সঙ্কুচিত বোধ করে, অপরে যাহা তোমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে শুনিলে তুমি ঘৃণা ও লজ্জায় মাথা লুকাও, এমন কথা যদি কখনও কহিতে ইচ্ছা যায়, তবে জানিবে, এই ইচ্ছাও কামেরই কার্য্য। সুখলোভের আশায় যাহাকে স্পর্শ করিতে গেলে বারংবার নিজেকে ঘোরতর অধর্ম্মাচারিণী ও পরম-পাপিষ্ঠা বলিয়া মনে জাগিবে, যাহার সংসর্গ সুখপ্রদ বুঝিয়াও মহাপাতকের কারণ বলিয়া মনে মনে অনুভব করিবে, যাহার প্রতি প্রাণের উন্মুখতা ও ব্যাকুলতা সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের বিরোধী বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে, চিত্ত যদি কখনও তাহার স্পর্শ বা সংসর্গ প্রার্থনা করে, মন যদি কখনও তাহার প্রতি ব্যাকুল হইতে চাহে, তবে

জানিবে, ইহা কামেরই কার্য্য। দেহের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভোগের কথা জনসমাজে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করা সম্ভব নহে, পিতার ক্রোড়ে বসিয়া যে সকল ভোগের কথা স্মরণে আনিতেও মন সশঙ্কিত ও কুণ্ঠিত হয়, পূর্ব্ব হইতে কেহ তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ে সৎশিক্ষা দান না করিয়া থাকিলেও যে জাতীয় ভোগের বিষয়ে মনের মধ্যে চিন্তা আসিবামাত্র তুমি তোমার নিজের সহজ জ্ঞানের দ্বারাই অনুভব করিতে পার যে, তুমি পাপ করিতেছ, অপরাধ করিতেছ, সেরূপ ভোগের লিপ্সা যদি কখনও তোমার মনে উদিত হয়, তবে জানিও, ইহা কামেরই কার্য্য। কাম যে কি বস্তু, তাহা কামের এই কার্য্যগুলি বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে।

পুরুষের কাম সাধারণতঃ স্ত্রীলোককে লইয়া বিব্রত থাকে এবং স্ত্রীলোকের কাম সচরাচর পুরুষকে লইয়া প্রবর্দ্ধিত হয়। বিষ-লতা যেমন মাকাল গাছ বাহিয়া বাড়িতে থাকে, ইহাও তেমনি। স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষ যখন অনুরাগ প্রকাশ করে, তখন প্রায়শঃই উহা কাম-রূপে পর্য্যবসিত হয়, আবার স্ত্রীলোক যখন পুরুষের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তখন অধিকাংশ সময়েই উহার সহিত কামের সংস্পর্শ থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া নারী ও পুরুষের অনুরাগ মাত্রেই কাম নহে। পিতা তাঁহার কন্যাকে ভালবাসেন, মাতা তাঁহার পুত্রকে ভালবাসেন, এই ভালবাসার নাম কাম নহে, ইহার নাম স্নেহ। ভ্রাতা ভগ্নীকে ভালবাসেন, ভগ্নী ভ্রাতাকে ভালবাসেন, ইহার নাম কাম নহে, ইহার নাম প্রীতি। পুত্র মাতাকে ভালবাসেন, কন্যা পিতাকে ভালবাসেন, ইহার নামও কাম নহে, ইহার নাম ভক্তি। পরন্তু কাম এই সকল ভালবাসার চাইতে পৃথক্ প্রকৃতির ভালবাসা, ইহা স্নেহ হইতে পৃথক্, প্রীতি হইতে পৃথক্, ভক্তি হইতে পৃথক। যাহাকে তুমি তোমার পুত্র বলিয়া মনে করিলে শোভা পায়, তাহাকে তুমি পুত্রের মত স্নেহ করিতে পারিলে না অথচ তাহার প্রতি তোমার মনের একটা তীব্র অনুরাগ অনুভূত হইল,—অনেক সময়েই ইহা কামেরই একটা লক্ষণ। যাহাকে তোমার ভ্রাতা বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে না, ভ্রাতার প্রাপ্য প্রীতি দিতে পারিলে না, অথচ তোমার প্রাণের এক গভীর অনুরাগ তাহার

প্রতি ধাবিত হইল,—জানিও এই ভালবাসাটুকু প্রকৃত ভালবাসা না হইয়া কাম হইবার সম্ভাবনাই বেশী। মনে কর, একজনকে দেখিলে তাহার প্রতি পিতার মত ভক্তি করিতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ভক্তি তোমার আসিল না, অথচ তুমি তাহার প্রতি হৃদয়ের অতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেছ, এমতাবস্থায় এই অনুরাগকে অধিকাংশ স্থলেই কাম বলিয়া সন্দেহ করিতে হইবে। কাম যে সকল সময়েই তাহার লজ্জাকর কুৎসিত মূর্ত্তি ধরিয়াই আবির্ভূত হইবে, এমন কোনও কথা নাই। কাম যে সকল দিনই তাহার জঘন্য উলঙ্গমূর্ত্তিতেই নগ্ন-শরীরেই মনের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে, তাহাও নহে। অনেক সময়ে কাম অতিশয় প্রচ্ছন্নভাবে মনের মধ্যে প্রবেশ করে, স্নেহের ছদ্মবেশ পরিয়া, প্রীতির ছদ্মবেশ পরিয়া, ভক্তির ছদ্মবেশ পরিয়া তাহার কদর্য্য নগ্নতাকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। এই সকল স্থলে কামের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। বলিতে কি, সাধনার বল না থাকিলে এই মুখস-পরা কাম-রিপুকে ধরিতে পারা বা দমন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপারেই গিয়া দাঁড়ায়।

কামের প্রধানতম সহকারী এবং বুদ্ধিদাতা মন্ত্রী হইতেছে মোহ। যে কামকে বহুচেষ্টায় একবার বিমর্দ্দিত করা হইয়াছে, মোহই তাহাকে পুনর্জ্জীবন দান করে, মোহই তাহাকে পরিপোষণ করে, মোহই তাহাকে বিবেকের বিরুদ্ধে রণসজ্জায় সজ্জিত এবং যুদ্ধকালে দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তোলে। মোহ অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলিয়া ভ্রম জন্মায়, অচিরস্থায়ী বস্তুকে চিরস্থায়ী বলিয়া বুঝাইয়া দেয়; যাহা পরিণামে অশেষ ক্লেশের কারণ, তাহাকে পরমসুখদ বলিয়া বিশ্বাস উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। মোহের ধর্ম্মই এই। অসত্যকে সত্য, অমঙ্গলকে মঙ্গল এবং অস্থিরকে স্থির বলিয়া বুঝানই মোহের কার্য্য। মোহবশে আমরা কুজ্ঝটিকাকে ভাবি চন্দ্রালোক, কুটিল গহন বনকে ভাবি রাজপথ, মৃত্যুময় বিষকে ভাবি নবজীবনদায়ক অমৃত, অমাবস্যার অন্ধকারকে ভাবি দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ। মোহ-বশে জীব রক্তমাংসকে ভাবে আত্মা, ক্লেদপূযকে ভাবে চন্দন-প্রলেপ, নরক-নিমজ্জনকে ভাবে স্বর্গসুখ। মোহ কোন বস্তুকেই তাহার স্বরূপে দেখিতে দেয় না; যাহা অপবিত্রতার খনি,

মোহ তাহাকে পবিত্র বলিয়া ভ্রম জন্মায়, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের সকল আবর্জ্জনার স্তূপ, তাহাকে রমণীয় পুষ্পোদ্যান বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়।

এই রিপুরাজ কাম আর এই কামমন্ত্রী মোহের উদ্ধত শির তোমাকে ছিন্ন করিতে হইবে জ্ঞানের বলে। এই জ্ঞান তুমি তপস্যার ফলে লাভ করিবে।

আজিকার ভারতবর্ষ প্রেমহীন নর-নারীর কাম-পাণ্ডুর পাপ-মলিন মুখবিবর্ণতা নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া বেদনাভিভূত হৃদয়ে ভবিষ্যতের নিষ্কাম নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক মানব-মানবীগণের পানে আশার দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে। আজ মা. তোমাদের পালা।

সমাজের স্তরে স্তরে অসংযমের মৃত্যুবীজ ছড়াইয়া আছে, কি মহিলা-মহলে কি পুরুষ-সমাজে সেই মহাবিষ শাখায়-পল্লবে অঙ্কুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করিতেছে। সমাজের পরতে পরতে মৃত্যুকীট প্রবেশ করিয়াছে, স্ত্রীপুরুষ বাছিবার তাহার প্রয়োজন নাই। যাহাকে যখন বাগে পাইতেছে, তাহাকেই সে তখন দর্শনস্পর্শে অপবিত্র এবং কোরকে বৃন্তচ্যুত করিয়া দিতেছে। পুরুষজাতি নীতিহীনতার ও অসংযমের যে মৃত্যুময় যন্ত্রণায় কাতর, দেশের সকল সৌভাগ্যকে ধিক্কৃত করিয়া নারীও আজ তাহার অংশভাগিনী। কিন্তু পুরুষজাতি কিছুদিন হইতেই আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইয়াছে,–এইবার মা তোমাদের পালা।

নারী-সমাজে যতগুলি পাপ লুকাইয়া লুকাইয়া আত্মবিস্তার ঘটাইতেছে, তোমাদিগকে তাহার শিরশ্ছেদন করিতে হইবে। দেহমনের পবিত্রতার বিরোধী যতগুলি কদাচার নারী-জগৎকে ঘানির পাকে ঘুরাইতেছে, তাহার প্রত্যেকটীকে নির্ম্মমভাবে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে। চরিত্রগত পূর্ণতা লাভের পথে যতগুলি কুশাঙ্কুর আজ নারীজাতির চরণে ক্ষত জন্মাইতে চাহিতেছে, তাহার প্রত্যেকটীকে ঝাড়ে বংশে উৎখাত করিতে হইবে। জীবনের বিশাল তরণীর সকল সম্পদ-সমৃদ্ধিতে লোক-লোচনের অজ্ঞাতসারে জলাঞ্জলি দিবার জন্য যতগুলি গুপ্ত পথ বা প্রচ্ছন্ন ছিদ্র মূষিকের দংশনে সৃষ্ট হইয়াছে, সবগুলিকে আজ রুদ্ধ করিতে হইবে, অপচয় অপব্যয় বন্ধ করিতে হইবে, জীবনকে আজ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে,

অস্থিমজ্জাতে সকল কুসংস্কারকে আজ চিরতরে বর্জ্জন করিতে হইবে, শিরায় শিরায় আজ নবজীবনের নূতন বিদ্যুৎ আস্বাদন করিতে হইবে। রক্তমাংসের শরীরকে আজ রক্তমাংসের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে হইবে, রক্তমাংসের ঊর্দ্ধ জগতে টানিয়া নিতে হইবে, রক্তমাংসের দাবীর চেয়ে বড় দাবী মিটাইবার যোগ্য করিতে হইবে, রক্তমাংসের প্রয়োজনের চেয়ে বড় প্রয়োজনের মুখপানে চাহিয়া চলিতে অভ্যস্ত করিতে হইবে।

বলিতে পার, নারীজীবনের পূর্ব্ব-অভ্যাস ও পূর্ব্বসংস্কার আজ চৌদ্দপুরুষ ধরিয়া যাহা চলিয়া আসিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। কিন্তু মা, আমি সে কথা মানিব না। চৌদ্দপুরুষের ক্রমিক দুষ্কৃতি যে অমঙ্গলকে জন্ম দিয়াছে, তিন পুরুষের উদগ্র তপস্যা তাহাকে ডালেমূলে উপাড়িয়া দিতে পারে। তিন পুরুষের কদাচার যে অপসংস্কারকে শ্রীবৃদ্ধিশীল করিয়াছে, তপস্যার মত তপস্যা হইলে এক পুরুষেই তাহার সমূল উচ্ছেদ-সাধন হইতে পারে। আমি মা তপস্যার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাসী, আমি কোনও যুক্তিতে ভুলিব না। অধঃপতিত নারীজাতিকে উন্নতির চরম সীমায় টানিয়া তুলিতে হইবে, ইহা অসম্ভব নয় মা, শুধু তপস্যা-সাপেক্ষ।

★ ★ ★ ★ ★

অত্র কুশল। পরমাত্মা তোমার মঙ্গল করুন। ইতি–

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

(জনৈকা সধবা মহিলার প্রতি)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৫

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

স্নেহের মা, অনেকদিন হইল তোমার পত্রখানা আসিয়াছে। সময়ের অভাবে উত্তর দিতে পারি নাই। সেজন্য দুঃখিতা হইও না। এখনও আমি মা বড়ই অনবসর। তাই, অতি সংক্ষেপেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

যৌবন ক্ষণস্থায়ী, দেহ ক্ষণভঙ্গুর, মন পরিবর্ত্তনশীল এবং সুখলাভ-

চেষ্টা সহস্র সহস্র স্থলেই ব্যর্থতাপূর্ণ। তথাপি যে নরনারী যৌবনমদে মত্ত হইয়া অচিরস্থায়ী দেহকে অক্ষয় অমর মনে করে, তথাপি যে নরনারী জীবনকে প্রবৃত্তির আবর্ত্তসঙ্কুল স্রোতে ভাসাইয়া দেয়, তথাপি যে নরনারী ক্ষণভঙ্গুর সুখলাভের চেষ্টাতেই ডুবিয়া থাকে, তাহার কারণ আত্মোপলব্ধির অভাব। একই অখণ্ড-পরমাত্মা নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া অবস্থান করিতেছেন,-তিনি তোমার মধ্যেও আছেন, যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তোমার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, নীচতা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও অহঙ্কারের পরিসর-বৃদ্ধি ঘটিতেছে, তাহাদের মধ্যেও আছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্য দিয়া বিভিন্ন ভাবে প্রকটিত হইতেছেন বলিয়া যে নিজেও ভিন্ন বা খণ্ড হইয়াছেন, তাহা নহে। সমুদ্রের মধ্যে কোটি কোটি মৎস্য, শুক্তি, কুম্ভীর, হাঙ্গর, তিমি এবং তিমিঙ্গিল বাস করিলেও যেমন সমুদ্র অখণ্ডই থাকে, তেমনি আমরা তাঁহার মধ্যে বাস করিলেও তিনি অখণ্ডই আছেন। পার্থক্য এই যে, মৎস্য, শুক্তি, কুম্ভীর প্রভৃতির উদরের অভ্যন্তরে সমগ্র সমুদ্রটা থাকে না, কিন্তু প্রত্যেক জীবের ভিতরেই সেই সর্ব্বভূতাত্মা-পরব্রহ্ম তাঁর পূর্ণ সত্তায় বিরাজ করিতেছেন।

স্বামীকে দেখিয়া স্ত্রীর ভিতরে যদি কামপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে, যে, এস্থলে স্ত্রীর ভিতরে আত্মোপলব্ধির অভাব আছে। বুঝিতে হইবে, এই স্থলে স্ত্রীর শুধু এইটুকুই মাত্র ত্রুটী যে, সে নিজের ভিতরে পরমাত্মাকে দেখিতে পাইতেছে না; উভয়ের ভিতরে যে পরমাত্মা বিরাজ করেন, তাহারা যে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ আত্মা নহেন, পরন্তু একই ব্রহ্মের দ্বিবিধ অবস্থান মাত্র,-তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। স্বামীর সংসর্গে স্ত্রীর যদি ভোগপ্রবৃত্তিই সন্ধুক্ষিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মূলদেশ এখানে আহত হইতেছে।

স্বামীকে পরমেশ্বর বলিয়া অর্চ্চনা করিবার শিক্ষা ভারতীয় রমণী-সমাজে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচলিত আছে। স্বামীকে পরম-দেবতা জ্ঞান করিবার উপদেশ, তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবার উপদেশ, তাঁহার মানুষী মূর্ত্তিকেই নিজ কল্পনার

বলে দৈব-বিভূতি-সম্পন্ন মনে করিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ ভারতীয় জনকজননীরা চিরকাল তাঁহাদিগের কন্যাদিগকে দিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান কালের সমাজ-সংস্কারক এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণ ইহার মধ্যে শুধু নারীর অবনতি, নারীর অধোগতি এবং নারীর দাসীত্বই দেখিতে পাইয়াছেন এবং সহস্র প্রকারে সতীর এই পতিপূজাকে নিন্দা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহারা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সবগুলিই যে অযৌক্তিক বা মিথ্যা, তাহা বলা চলে না। কিন্তু সাধন-দৃষ্টির অভাব-বশতঃ তাঁহারা পতিপূজার অন্তর্নিহিত সত্যটুকুকেও উপেক্ষা করিয়াছেন।

স্বামীকে ব্রহ্মবোধে অর্চ্চনা করিবার অন্তর্নিহিত মঙ্গলটুকু এই যে, যাঁহার প্রতি ব্রহ্মবোধ উদ্দীপিত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি কামভাব বা ভোগলিপ্সা কখনও জাগ্রত হইতে পারে না। আর স্বামীকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করিতে করিতে উপাসিকা সতী নারী নিজের মধ্যেও সেই ব্রহ্মবোধকে বিসর্পিত দেখিতে পান।

ব্রহ্মানুভূতি বা আত্মোপলব্ধির প্রণালীর মধ্যে দুইটী বিশিষ্ট পন্থা আছে। এক পন্থায় প্রথমতঃ অপরের প্রতি ব্রহ্মভাব জন্মাইতে হয় এবং পরে সেই ব্রহ্মভাব নিজের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। অপর পন্থায়, প্রথমতঃ নিজের মধ্যে ব্রহ্মভাবের আরোপ করিতে হয় এবং পরে তাহা অপরের মধ্যেও আপনিই প্রসার প্রাপ্ত হয়। বৈদিক-যুগের তপস্বিনী ঋষি-পত্নীরা সাধারণতঃ শেষোক্ত পথেই চলিতেন, আগে নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনুভব করিয়া তৎফলস্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডময় ব্রহ্মদর্শন করিতেন এবং তখন স্বামীও ব্রহ্মই হইয়া যাইতেন। এই ভাবেই তাঁহারা ব্রহ্মময় ধর্ম্মের সংসার করিতেন। তান্ত্রিক-যুগের তপস্বিনী গৃহিণীরা সাধারণতঃ প্রথমোক্ত পন্থারই অনুবর্ত্তন করিতেন, আগে স্বামীকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনুভব করিয়া তৎফলস্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডময় ব্রহ্মদর্শন করিতেন এবং তখন নিজেও ব্রহ্মই হইয়া যাইতেন। এইভাবেই তাঁহারা ব্রহ্মময় ধর্ম্মের সংসার করিতেন। ইঁহাদের জীবনে গৃহীর আচার ছিল, ব্যবহার ছিল, গৃহীর আনন্দ, গৃহীর উল্লাস সবই ছিল, স্বামি-স্ত্রীর প্রেমময় ভাব ছিল, সন্তান-জনন, সন্তান-পালন, সন্তান-শিক্ষা প্রভৃতি

যাবতীয় ঝন্‌ঝটই ছিল, কিন্তু ছিল না শুধু কাম, ছিল না শুধু প্রবৃত্তি। বৈদিক-যুগের গৃহিণীরা ছিলেন ব্রহ্মব্রতা, পাতিব্রত্য তাহার ফল। তান্ত্রিক-যুগের গৃহিণীরা ছিলেন পতিব্রতা, ব্রাহ্মব্রত্য তাহার ফল।

ভারতবর্ষের আসন্নপ্রায় ভবিষ্যৎ নবযুগ নির্দ্দিষ্ট ভাবে তন্ত্রযুগ বা বেদযুগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে না। ভারতের ভবিষ্যৎ আধারভেদে পথের ভেদ মানিবে, সাধক-সাধিকার যোগ্যতার অনুযায়ী পন্থার নির্দ্দেশ করিবে। কোন্ পথ যে কাহার গ্রহণীয়, নবযুগের ভারত-সন্তান তাহা নিজ নিজ সাধনের বলে আবিষ্কার করিয়া লইবে।

তোমাকেও কোন্ পথ লইতে হইবে, তাহা তুমি নিজের শক্তিতে বাহির করিয়া লও। পরমাত্মার বজ্রগর্ভ বহ্নিপিণ্ডসম জ্বলন্ত মহানামে প্রাণমন ঢালিয়া দাও। নাম জপিতে জপিতে যখন যাঁহার কথা মনে পড়িবে, তখন তাঁহাতেই চিত্তের সমগ্র ভক্তি ঢালিয়া দিয়া তাঁহার প্রতি ব্রহ্মভাব আরোপ কর। এই ভাবে সাধন করিতে করিতেই তোমার পথ তোমার সমক্ষে খুলিয়া যাইবে।

"এত প্রবৃত্তি কেন?"—এই প্রশ্নের উত্তর,—"আত্মোপলব্ধির অভাবহেতু, নিজেকে জানিবার অক্ষমতা হেতু।" "এত প্রবৃত্তি কেন?" এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর,—"যে তপস্যায় জীবে জীবে শিববুদ্ধি জাগ্রত হয়, ঘটে ঘটে ব্রহ্মানুভূতি প্রদীপ্ত হয়, এই তপস্যায় বিরতিহেতু।" ভগবানের নামে নিজেকে বিকাইয়া দাও, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের যখনই যাহাকে নিরীক্ষণ কর, তখনই তাহাকে মনে মনে পরমেশ্বরের পরমপ্রেমময় নাম ধরিয়া ডাক,—প্রবৃত্তির প্রবল স্রোত থামিয়া যাইবে, অনবদ্য প্রেমের মহামধু কামের বিষকে পরাজিত করিবে।

নামের প্রভাবে প্রেম উপজিবে চিতে,
ফুটিবে জ্ঞানের দীপ্তি তোর চারিভিতে।
কর্ম্মময় জীবনের সকল মণ্ডলে
তাঁর জ্যোতির্ম্ময় নাম সদা যেন জ্বলে।
তীব্র কালকূট হবে অমৃত সমান
নামেতে সমগ্র প্রাণ কর যদি দান।

আমার কি মনে হয় জানো মা? আমার মনে হয়, আত্মোপলব্ধির অভাবই স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার চরম বাধা, নতুবা সমাজ বা লোকাচার অধিক শক্তি ধরে না। আগে চাই অন্তর্জাগরণ, বহির্ম্মুখ স্বাধীনতা তাহার স্বাভাবিক ফলমাত্র। আজ তোমাদের সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠুক, বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্যের সাধনা তোমাদের মধ্যে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের অপরিসীম জ্বালামালা লইয়া জ্বলিয়া উঠুক, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেকের বজ্রহুঙ্কার তোমাদের মোহ-তন্দ্রার চির অবসান করুক।

আজ তবে আসি মা। তোমরা সকলে আমার শুভাশিস গ্রহণ করিও।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৭)

(জনৈকা ব্রহ্মচারিণীর প্রতি)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৫

নিত্যাশীর্ভাজিনীষু:-

স্নেহের মা, নিজের জীবনটাকে ষোল আনা ভগবানের মধ্যে ডুবাইয়া না দিতে পারিলে আর কিছুতেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদিত হয় না। ভগবানকে নিজের মধ্যে পাওয়া এবং নিজেকে ভগবানের মধ্যে পাওয়াই হইতেছে সকল তপস্যার চরম সিদ্ধি, ইহাই জীবের পরম প্রাপ্তি। নারী ও পুরুষে এই বিষয়ে ব্যবস্থার ভেদ নাই,—সকলেরই মুখ্য লক্ষ্য একমাত্র পরমাত্মায় আত্ম-সমর্পণ এবং আত্মায় পরমাত্মাকে দর্শন।

এই যে আত্মদর্শন, ইহারই মধ্য দিয়া নারী-জাতির যথার্থ উন্নতি এবং যথার্থ স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আত্ম দর্শনের মধ্য দিয়াই নারীর জীবন ঘৃণাভরে উপেক্ষিত দাসীর জীবন হইতে—ষড়ৈশ্বর্য্য-শালিনী দিব্যদীপ্তিমালিনী কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-পালিনী ভগবতীর জীবনে পরিবর্ত্তিত হইবে। সাধক-পুরুষ আজ যাহাকে তপো-বিঘ্ন-কারিণী বলিয়া বর্জ্জন করিতে প্রয়াস

পায়, আত্ম-দর্শন তাহাকে পরমশ্লাঘনীয়া করিবে। আজ যাহাকে পদসেবার কিঙ্করী বলিয়া গর্ব্বিত পুরুষ অবহেলা করে, আত্মদর্শন সেই নারীকে পুরুষের সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাত্রী সুখসৌভাগ্যবিধাত্রী মহালক্ষ্মীতে পরিণত করিবে। আজ যাহাকে দেখিলে পুরুষের নীচ লালসা ও হীন প্রবৃত্তি ব্যতীত অপর কিছুই জাগ্রত হয় না, আত্মদর্শন তাহাকে সর্ব্বজনবরেণ্যা ত্রিভুবনধন্যা জগজ্জননীতে পরিণত করিবে। আজ যাহাকে পুরুষ করে কদর্য্য সম্ভাষণ, আত্মদর্শন তাহাকে সসম্ভ্রম স্তুতির যোগ্যা করিবে; আজ যাহার প্রতি পুরুষ করে কদর্য্য ব্যবহার, আত্মদর্শন তাহাকে করিবে পুরুষ-জাতির পূজার দেবতা।

স্ত্রীস্বাধীনতার আমি মা বড়ই পক্ষপাতী, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের অনুকরণে আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারকগণ যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া প্রচার করিতে চাহিতেছেন, ঠিক্ তাহাকেই স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিয়া গ্রহণ করিতে আমি কুণ্ঠিত হই। স্ত্রীজাতি পুরুষ-জাতির সহিত জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান অধিকার, সমান সুযোগ সমান স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবে,–ইহা স্বাধীনতার একটি বহির্লক্ষণ মাত্র, কিন্তু ইহাই স্বাধীনতার সম্যক্ স্বরূপ নয়। স্বাধীনতার জন্ম হইতেছে আত্মদর্শনে, নিজেকে জানায়, নিজের সহিত ভগবানকে এবং ভগবানের সহিত নিজেকে ওতপ্রোতভাবে যোগযুক্ত অনুভব করায়। স্বাধীনতার বহির্লক্ষণগুলি পরিদৃষ্ট না হইলেও, যিনি ইহা করিয়াছেন, সেই নারী স্বাধীন, অর্থাৎ তিনি পুরুষের মত অফিসে চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন না করিলেও স্বাধীন, ট্রাম, রেল, মটরকার বা সাইকেল না চালাইলেও স্বাধীন, ব্যবস্থাপক-সভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়া বিল পাশ করিবার চেষ্টা না করিলেও স্বাধীন অথবা জেলার জজ হইয়া বিচার-কার্য্য কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শাসন পরিচালন না করিলেও স্বাধীন। অপর পক্ষে আত্মদর্শন যাহার নাই, তিনি এ সকল ত' সামান্য কথা, ইহা অপেক্ষা শতগুণ উর্দ্ধে উঠিয়া লম্ফঝম্ফ মারিলেও স্বাধীন নহেন। পুরুষের সহিত সকল ক্ষেত্রে সমান পায়ে চলিতে পারা স্বাধীনতার একটা বাহিরের লক্ষণ মাত্র,–কিন্তু ইহা শুধু স্বাধীনতারই লক্ষণ নহে, সময়-বিশেষে পরাধীনতা হইতেও এই লক্ষণগুলি প্রকটিত হইতে পারে। যেমন ধর,

একজন লোকের ঘন ঘন দাস্ত হইতেছে। এই দাস্ত কথাটা শুনিয়াই বলা চলিবে না, তাহার রোগ কলেরা কি টাইফয়েড। কেননা, কলেরা হইতেও দাস্ত হয়, টাইফয়েড হইতেও দাস্ত হয়।

ভারতবর্ষে আজ মা স্বাধীনতারই দিন পড়িয়াছে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, শিক্ষায়, সমাজে, সংস্কারে ও রাষ্ট্রে সর্ব্বত্র আজ স্বাধীনতারই বিজয়-দুন্দুভি বাজিবে। ইহাই আজ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অভিপ্রায়। আজ তোমাদিগকেও এই স্বাধীনতার রুদ্রমন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে। কিন্তু মা, মনে রাখিতে হইবে, সকল স্বাধীনতার মূল হইতেছে আত্মদর্শনে। নিজেকে জানিবার পূর্ব্বে কখনও প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয় না, স্বাধীনতার নাম করিয়া স্বৈরাচার ও ব্যভিচার হয় মাত্র।

কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। মনে কর, একটী স্ত্রীলোক বলিল,–"আমি স্বাধীন, সুতরাং কোনও বিষয়ে অপর কাহারও কর্ত্তৃত্বের ধার ধারিতে আমি বাধ্য নহি, আমার বিবাহ ইচ্ছামত হইবে, ইচ্ছামত ভাঙ্গিবে, জীবিকার্জ্জনের পথ আমি ইচ্ছামত গ্রহণ ও বর্জ্জন করিব, ইহার জন্য যদি আমার চরিত্রগত সম্পদের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু ঘটিতে যায়, তবে তাহা আমারই ঘটিবে, এই বিষয়ে অন্য কাহারও কিছু বলিবার, কহিবার বা করিবার নাই।" স্ত্রীলোকটী সত্য কথাই বলিয়াছে, প্রকৃতই নারীও পুরুষের ন্যায় সর্ব্ববিষয়েই স্বাধীন। সে যদি স্বেচ্ছায় কাহরও অধীন না হয়, তাহা হইলে ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ কেহ তাহাকে নিজ অনুবর্ত্তিনী করিতে অধিকারী নহে। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটী যদি আত্মদর্শিনী না হয়, তাহা হইলে ব্যাপার কেমন দাঁড়াইবে? বিলাস-লালসাময়ী চপলা-বুদ্ধির প্ররোচনায় সে পিশাচীবৎ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিবে। বাহিরের ব্যবহারে লোক-শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা তাহার যতই থাকুক, ভিতরে ভিতরে সে অন্তঃসারশূন্যা হইবে, সদাচারের মস্তকে লগুড়াঘাত করিবে, ভোগ-তৃষ্ণায় আকুল দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য ভাবে নিয়ত সে যৌবন-মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমানা রহিবে, জীবন-কাননের মধ্যে সে শুধু দুর্ভাবনারূপ বিষলতার ছায়ারই অনুসন্ধান করিবে এবং বসন্তের প্রথম হিল্লোলে শুধু হাহাকার, শুধু রোদনেরই ধ্বনি

তাহার শ্রবণে প্রবেশ করিবে, তাহার চম্পক অঙ্গুলিচয় বাছিয়া বাছিয়া শুধু অশ্রুবিন্দুরূপ কুসুমনিচয়ই চয়ন করিতে থাকিবে। ভোগ তৃষ্ণার তাড়নায় সে যখন যাহাকে দেখিবে, তাহারই প্রতি আকৃষ্টা হইবে, তাহারই উদ্দেশ্যে জীবনের উদ্যাম নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে চাহিবে, তাহারই গলৎকুষ্ঠ-কলঙ্কিত পদতলে আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুলা হইবে, যে পুরুষ তাহার চিন্তারও যোগ্য নয়, তাহাকেই জীবন-সাধনার সঙ্গী করিতে চাহিবে এবং লোভী মৎস্যের ন্যায় বড়িষে বিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া মরিবে, যৌবন-লালসায় অন্ধ হইয়া সে সদসদ্ বিচারে অসমর্থা হইবে, ঝটিকাক্ষিপ্ত শুষ্ক তৃণের ন্যায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে দিগ্‌দিগন্তরে পরিচালিত হইবে, বাসনার বন্যায় গলিত পত্রের ন্যায় সে কখনও ভাসিবে, কখনও ডুবিবে। স্বাধীনতার অনুসন্ধানে বাহির হইয়া সে ভ্রান্ত কপোতীর ন্যায় জালে আবদ্ধা হইবে এবং হিংস্র শ্যেনপক্ষীর চঞ্চু হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া সে হিংস্রতর ব্যাধের কবলে পড়িবে, বারংবার সে প্রবঞ্চিত হইবে, বারংবার সে প্রতারিতা হইবে, কপটীর কপটতা, শঠের শঠতা শতবার তাহার নারী-মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ন, আহত, অপমানিত ও পদদলিত করিবে।

কিন্তু আত্মদর্শনের উপরে যাহার স্বাধীনতার ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই নারী কি অবস্থায় কি করিবে? সুখতৃষ্ণা ও ভোগ প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রণোদনা কি তাহার আত্মনিষ্ঠ কল্যাণবুদ্ধিকে পরাভূত করিতে পারিবে? মায়ামরীচিকা কি কখনও তাহার মঙ্গল-দৃষ্টিকে মোহ-মেঘাচ্ছন্ন করিতে পারিবে? আকাশকুসুম কি কখনও তাহাকে প্রলুব্ধা করিতে পারিবে? সে যদি প্রকাশ্য জনস্থলীতে মস্তকের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেয়, বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া যদি নেতৃত্বের বল্গা ধারণ করে, উন্মত্ত জনস্রোতের মাঝখানে যাইয়া যদি চতুর্ভুজে চতুরস্র সাম-দান-ভেদ-দণ্ড পরিচালনা করে, একজন পুরুষও কি তাহার রূপ লইয়া ব্যবসায় ফাঁদিতে, তাহার যৌবন লইয়া ছেলেখেলা করিতে সাহস পাইবে? একজন লম্পটও কি তাহাকে দিয়া বানরী নৃত্য নাচাইতে পারিবে? সে কি কখনও চতুরের চাতুরীতে, শয়তানের ষড়যন্ত্রে, পাপিষ্ঠের কারসাজিতে আটক পড়িবে? সে কি কখনও রমণী-লোলুপ বহুবল্লভ পুরুষ-

রাক্ষসের প্রবঞ্চনার জালে আবদ্ধ হইয়া জীবনব্যাপী তৃষ্ণানুসরণের বিনিময়ে দুঃখময়ী প্রতারণার বিষময় ফল আহরণ করিবে?

হে মা, আজ আত্মদর্শনের সাধনাই তোমার জীবনের প্রথম সাধনা। সমাজ-সাধনা ও দেশ-সাধনা এই আত্মদর্শনের সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক। ★★★ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৮)

ওঁ ব্রহ্মগুরু — পুপুন্‌কী আশ্রম
১৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৫

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

সংসারের নীচতা তাহাকেই স্পর্শ করে, সংসারটাকে "আমার" "আমার" বলিয়া যে পাগল হয়। পরন্তু সংসারটাকে ভগবানের বলিয়া যার মনে থাকে, সংসারকূপের গভীরতম তলে ডুবিয়া থাকিয়াও তাহার গায়ে ক্লেদপঙ্ক লাগে না। তোমাকেও তেমনি সংসারী করিতে হইবে। স্বামীর প্রাপ্য স্বামীকে দিয়া, দেবরের প্রাপ্য দেবরকে দিয়া, সন্তানের প্রাপ্য সন্তানকে দিয়াও তুমি নির্ব্বিকারচিত্ত রহিবে এবং নিরন্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাণযোগে ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ করিবে। সংসারকে ভগবানের ভিতরে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা লইয়া গার্হস্থ্য-সাধনায় অগ্রবর্ত্তিনী হও মা। গৃহীর জীবনে স্থল-বিশেষে কামের স্থান আছে, ক্রোধের স্থান আছে, কিন্তু তাহাদের অনুষ্ঠান ভগবানকে ভুলিয়া চলিতে পারে না। বংশধারা রক্ষা গৃহীর এক আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কিন্তু ইহাও হইবে প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নহে, একমাত্র প্রয়োজনের অনুরোধে এবং দম্পতী নিজদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বোধ করিয়া জনন-ক্রিয়াকেও ব্রহ্ম-পূজার অঙ্গীভূত করিয়া। দুষ্ট ছেলে অবাধ্য হইলে সংসারাশ্রমী মাকে স্থলবিশেষে ক্রোধ প্রকাশ করিতেও হইবে কিন্তু ক্রোধের বশীভূত হইয়া নহে, ক্রোধকে নিজবশে আনিয়া এবং নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ, সন্তানকে ব্রহ্মস্বরূপ এবং শাসনকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া। ব্রহ্মনাম এই ব্রহ্মবোধকে উদ্দীপ্ত এবং নিত্যস্থায়ী করে। অতএব মা, নামসেবায় একান্ত

নিষ্ঠাবতী হও এবং নামসেবার মধ্য দিয়া সকল কল্যাণকে করায়ত্ত কর।

গৃহীর জীবন হইতে ব্রহ্মসাধনা আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে,-তোমরা মা আজ অপ্রতিম পুরুষকার-সহকারে সেই পবিত্র সাধনাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর। তোমাদের সাধনোজ্জ্বল দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সুকুমারী বালিকারা নিজেদেরই অজ্ঞাতসারে ভবিষ্যৎ পবিত্র গার্হস্থ্যের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকুক। সংসারী হিসাবে তোমরা সংসারী করিয়াও সাধিকা হিসাবে সুগভীর সাধনাও কর। আবার ভারতের গার্হস্থ্যাশ্রম মৈত্রেয়ী ও অরুন্ধতীর তপস্যায় উজ্জ্বল হউক। আবার ভারতের নারী সঙ্ঘমিত্রার ন্যায় ধর্ম্মের ধ্বজা বহন করিয়া দেশে-বিদেশে তাহাকে প্রোথিত করিতে সুসমর্থা হউক। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

ওঁ ব্রহ্মগুরু — পুপুন্‌কী আশ্রম
১৭ই বৈশাখ, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

মা,★★★ সকলের চাইতে বড় কথা এই যে, তোমাকে তোমার সুদূর দৃষ্টি প্রসারিত রাখিতে হইবে ভবিষ্যতের দিকে। তোমাকে জানিতে হইবে যে, যদিও তুমি বর্ত্তমানের সহস্র অসুবিধা এবং বিঘ্নবিপদের পসরা মাথায় লইয়াই ভূমিষ্ঠা হইয়াছ, তথাপি তোমার জীবনের বিশুদ্ধ উৎসর্গ হইবে শুধু ভবিষ্যতের অগণিত নারী-কর্ম্মীদের আবির্ভাবের জন্য, তোমার ব্যক্তিগত কোনও প্রকার মান, যশ বা কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। নিজের জন্য জগতে তুমি কিছু চাহিতে পার না, নিজের জন্য জগতে তুমি কিছুই করিতে পার না, তোমার সকল প্রার্থনা ও কর্ম্মশীলতা শুধু পরেরই জন্য।

কিন্তু ভবিষ্যতের নারীজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ সেবা তুমি কখন করিয়াছ বলিব? যখন দেখিব, নারীর পরমুখাপেক্ষা তুমি ঘুচাইয়াছ, তখনই জানিব যে, তুমি নারীর উৎকৃষ্টতম কল্যাণ সাধন করিয়াছ। পুরুষের পায়ে ধরিয়া যদি নারী বড় হইতে চাহে, তবে জানিও, এই বড় হওয়া ঠিক্ ঠিক্ বড়

হওয়া নহে, ইহা ছোট হওয়ারই প্রকারান্তর। তাই নারীকে যদি জাগিতে হয়, তবে জাগিতে হইবে আত্মচৈতন্যের শক্তিতে। 'আত্মচৈতন্য' বলিতে আমি 'নিজেকে চৈতন্য'ও বুঝি, 'ব্রহ্মের চৈতন্য'ও বুঝি। নারী যখন নিজেকে সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাত্রী ত্রিকালবিধাত্রী আদ্যাশক্তি জানিয়া স্বজাতির উন্নতিতে মন দিবে, তখনই সে বড় হইবে। অথবা নারী যখন ব্রহ্ম-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই জীবনের জীবন, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা জানিয়া তাঁহার শক্তির, তাঁহার করুণার প্রবাহে স্বজাতির নৌকা ভাসাইবে, তখনই সে বড় হইবে। নারী জাতির বড় হইবার পথ বক্তৃতাও নহে মা, কলমবাজিও নহে। একমাত্র আত্মনিষ্ঠাই উন্নতির পথ। "আত্মনিষ্ঠা" 'নিজেতে নিষ্ঠা' এবং 'ব্রহ্মনিষ্ঠা' উভয়ই বুঝায়।

★ ★ ★ ★ ★

ভাল আছি। তোমাদের কুশল চাই। ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২০)

ওঁ ব্রহ্মগুরু — পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

স্নেহের মা, ★★★ তোমার জীবনটা যে বলিদানের জন্যই প্রস্তুত হইতেছে, এক কণা স্বার্থও যে তোমার প্রাপ্য বা প্রার্থনীয় নহে, ভোগদৃষ্টি ও ভোগবুদ্ধি যে তোমার পক্ষে চিরবর্জ্জনীয়, এই কথা মা তোমাকে অহর্নিশ মনে রাখিতে হইবে। শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া তপ্তরক্তের অঞ্জলি প্রদানই যে তোমার একমাত্র ধর্ম্ম, প্রত্যেকটী চিন্তা ও চেষ্টায় তাঁহারই অভীপ্সিত সাধন করাই যে তোমার একমাত্র ব্রত, এই কথাই মা নিয়ত ধ্যান করিতে থাক। তিনি যখন চাহিবেন, জগতের হিতার্থে কাঁচামাথা সেদিন কাটিয়া দিতে হইবে; তিনি যখন দাবী করিবেন, সর্ব্বস্ব তখন বিনা দ্বিধায়, বিনা আপত্তিতে জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে। অতীত এবং বর্ত্তমানের লাজ-ভয়-ম্রিয়মাণা, ত্রাস-শঙ্কিত-নয়না নারী যেমন বিপদের

মুখে সঙ্কটের সম্মুখে ভীরু কাপুরুষের মত গতচেতনা বা পলায়মানা হয়, নবযুগের তপঃশক্তিপ্রবুদ্ধা মহানারীকে তাহা হইলে চলিবে না। কালীর মত সে হইবে করালী, ছিন্নমস্তার মত সে হইবে ভয়ঙ্করী।

* * * * *

ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৮ই আষাঢ়, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

* * * কিছু দিবস পূর্ব্বে যখন গুরুবাদের খুব প্রভাব ছিল, তখন একটা প্রশ্ন অসংখ্য নারীর মনেই সর্ব্বদা জাগিত, সতীত্ব বড়, না গুরুসেবা বড়? সম্প্রতি নারীদের মনে আর এক প্রশ্ন জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, সতীত্ব বড়, না দেশসেবা বড়? গুরুবাদের যুগে অসংখ্য রমণী এই প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব খুঁজিয়া পাইত না বলিয়া গুরু-নামধেয় রক্ত-মাংসের পায়ে সতীত্বের পবিত্র কুসুম অঞ্জলি ভরিয়া ডালি দিত এবং অন্তরের ভিতরে অপরাধের গ্লানি শতবার সংগুপ্ত ভাবে অনুভব করিয়াও বিবেকের দংশন হইতে বাঁচিবার জন্য কদাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া মনকে কোনও ক্রমে বুঝ মানাইতে চেষ্টা করিত। বর্ত্তমানে একদল মহিলা দেশসেবার জ্বলন্ত আগ্রহের তাড়নায় দেশকর্ম্মী নামের ছদ্মবেশে আত্মগোপনকারী কোনও কোনও ব্যাধের জালে জড়াইয়া নিজেদের মান, নিজেদের মর্য্যাদা, নিজেদের চরিত্র, নিজেদের পবিত্রতা প্রভৃতি সব কিছু সম্পদ স্বেচ্ছায় খোয়াইয়া তারপরে এক অভিনব দর্শন-শাস্ত্র রচনার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে যে, দেশকে বড় করিবার জন্য নিজেকে ছোট করা দোষ নয়, নিজেকে পশুতে পরিণত করা অপরাধ নয়। গুরুকে সেবা করিতে যাইয়া যাহারা সতীত্ব হারাইত, তাহারা যেমন সতীত্ব বড়, না গুরুসেবা বড়, এই প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া পায় নাই, দেশকে সেবা করিতে যাইয়া যাহারা সতীত্ব হারাইতেছে, তাহারাও তেমন দেশসেবা বড়, না সতীত্ব বড়, এই প্রশ্নের জবাব পাইতেছে না।

অথচ কোনও জবাব পাইবার পূর্ব্বে সতীত্বকে পদদলিত করা, পবিত্রতার গলায় কসাই-খানার ছুরি চালান, একদিকে যেমন আত্মপ্রতারণা ও বিপজ্জনক, অপর দিকে তেমন আত্মহত্যাও অপরাধ-জনক। এই জন্যই প্রত্যেক নারীকে জীবন-সাধনায় সতীত্বের স্থান ও মর্য্যাদা নির্ণয় করিতে হইবে। গুরুকে ভক্তি করিতে যাইয়া, দেশকে সেবা দিতে যাইয়া কোথায় সতীত্বের কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি, কি প্রভাব, কি পরিস্থিতি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে।

অবশ্য এই নির্দ্ধারণ ও এই জানার পূর্ণতা ও সত্যতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে সাধনের তীব্রতা ও একনিষ্ঠার উপরে। যে যত অধিক সাধন করিবে, সে তত অধিক সত্য জানিবে। যে যত গভীর সাধন করিবে, সে তত গভীর সত্য জানিবে। যে যত নির্ভুল সাধন করিবে, সে তত নির্ভুল সত্য জানিবে।- বলাই বাহুল্য, সাধন বলিতে এখানে আমি ভগবৎ-সাধনই বুঝিতেছি।

আমার মতে গুরুসেবার সহিত সতীত্ব-সাধনার বিরোধ নাই, কোনখানেই নাই এবং কণামাত্রও নাই। সতীত্বের দীপ্তি যার সূর্য্য-রশ্মির মত প্রখর, সে-ই প্রকৃত গুরুসেবা করিতে পারে, অসতী নারী তাহা পারে না,-গুরুর পা টিপিলেও পারে না, গুরুর ফটো পূজা করিয়াও পারে না। কেননা, রক্ত-মাংসের দেবতার নিকটে রক্ত-মাংসের নৈবেদ্য উপহার দেওয়া কখনই গুরুসেবার স্বরূপ নহে। আধ্যাত্মিক শক্তিশালী সুমহান্ আত্মার নিকটে অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষ পবিত্রচেতা আত্মার সশ্রদ্ধ আত্মসমর্পণই গুরুসেবা। গুরুসেবা করিতে গিয়া যেখানে পবিত্রতায় বলি দিতে হয়, বুঝিতে হইবে, সেখানে হয় সেবার মধ্যে, নয় সেব্যের মধ্যে, অথবা সেবিকার মধ্যে গলদ আছে। এই গলদের জন্য সতীত্ব অপরাধী নয়, এই গলদের জন্য সতীত্বকে গালি দেওয়া যায় না, এই গলদের জন্য সতীত্বের ফাঁসী হইতে পারে না। সতীত্বকে তাহার প্রাণ লইয়া অক্ষুণ্ণ শরীরে অটুট স্বাস্থ্যে অব্যাহত ভাবে থাকিতে দিতে হইবে। অধিকন্তু যাহার মধ্যে গলদ ঢুকিয়াছে তাহাকেই নিজ ক্রটীর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই আত্মসংশোধনের উপায় ভগবৎ-সাধনা। দেশ-সাধনার সহিতও সতীত্ব-সাধনার বিরোধ নাই। সতীত্ব

বিকাইয়া যদি কখনও দেশের সেবা করিতে হয়, তবে জানিতে হইবে, হয় দেশের সেবা সম্বন্ধে কোনও অসত্য ধারণা জন্মিয়াছে, নয় দেশ-সেবিকার মনের মধ্যে যে কদর্য্য মলিনতা রহিয়াছে, তাহাকেই গিল্টি করিয়া সোণা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য সতীত্ব দায়ী নয়, এই মলিনতার জন্য সতীত্ব দোষী নয়, সুতরাং ইহাদের জন্য সতীত্বকে শূলে চড়ান চলিতে পারে না। অতএব একদিকে সতীত্বকে তাহার শোভন সৌন্দর্য্যে ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিয়া মোহন সৌরভ ছড়াইতে থাকুক, অপর দিকে দেশ-প্রেম সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণা এবং দেশ-কর্ম্মিণীর নিজ মনের কুৎসিত মলিনতা ভগবৎ-সাধনার মধ্য দিয়া নিজেদের কুরূপ পরিহার করিতে সমর্থ হউক। ★ ★ ★ ইতি –

শুভার্থী

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৯শে আষাঢ়, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়াসুঃ–

★ ★ ★ কোন পুরুষ বিবাহ করিলেই লোক তাহাকে "স্বামী" সংজ্ঞা দেয়। সে পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে প্রশংসনীয় বা অপ্রশংসনীয় যেমন ব্যবহারই করুক না, লোকে তাকে "স্বামীই" বলে। সে যদি তার স্ত্রীর একটা ক্রীতদাসও হয়, সে যদি তার স্ত্রীর একটা কামের কিঙ্করও হয়, সে যদি তার স্ত্রীর মুখলাস্যের বা দেহ-সৌন্দর্য্যের কেনা গোলামও হয়, তবু লোকে তাকে "স্বামী" বলে, "দাস" বলে না। স্ত্রীর উপরে যদি তার কল্যাণকর প্রভুত্ব নাও থাকে, কোনও মঙ্গল-প্রভাব নাও থাকে, স্ত্রীর মনকে সৎপথে, সংযমের পথে, পবিত্রতার পথে টানিয়া আনিবার যদি তার কণামাত্রও শক্তি না থাকে, নিষ্কলুষ ভালবাসার শক্তিতে স্ত্রীর নিম্নগামিনী মনোবৃত্তিকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া আনিবার যদি তার কোন যোগ্যতা নাও থাকে, তবু লোকে তাকে স্বামীই বলে। নামকরণের কৃতিত্ব লোকের এমনই অসাধারণ যে, স্ত্রীর মনে যখন ঝড়ের পবন বহিতে থাকে, বাসনার কীর্ত্তিনাশা নদী প্রবল তরঙ্গ-তাড়নে

মাঝিহীন তরণীখানাকে অকূলেই ডুবাইয়া দিতে চায়, প্রতি মুহূর্ত্তে যখন স্ত্রীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, স্ত্রীর ধর্ম্ম, স্ত্রীর সংযম মৃত্যু-ভয়ে নিয়ত কম্পমান, তখন যাহার সংসর্গ, এ ঝড় থামানো ত' দূরের কথা ঝড়ের বেগ বাড়াইয়া দেয়, তরঙ্গ-মালার ক্রুদ্ধ আক্রোশে ইন্ধন যোগায়, তাহাকেই লোকে নাম দেয় "স্বামী"। বলিতে কি, "স্বামী" শব্দটা ইহাদের সংস্পর্শে যাইয়া নিজেকে যে কঠোর অপমানে দণ্ডিত করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। আমার মতে স্ত্রীর মন হইতে পাপের প্রভাব যে দূর করিয়া দেয়, সেই প্রকৃত "স্বামী"। পাপের প্রলোভন হইতে, মোহের মত্ততা হইতে, কামনার কালকূট হইতে স্ত্রীকে যে রক্ষা করিতে পারে, সেই প্রকৃত "স্বামী"। দেহ-লালসার জন্য যে স্ত্রীর হৃদয় জয় করে না, করে তার নিজ পূর্ণতা দিয়া অপরকে পূর্ণ করিবার জন্য, স্ত্রীকে যে বিলাস-মদিরায় আচ্ছন্ন করিবার জন্য ভালবাসে না, বাসে তাহাকে মৃত্যু-তিমির-গহন কন্টকবন হইতে উদ্ধার করিয়া অমরত্বের জ্যোতির্ম্ময় শান্তি-স্নিগ্ধ পথে টানিয়া আনিতে, তার নাম "স্বামী"। যাঁর কটাক্ষের ইঙ্গিতে মিথ্যা চিন্তা স্তব্ধ হয়, বিলাস-বুদ্ধি লুপ্ত হয়, তিনিই "স্বামী"। এই স্বামী তাঁর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন বিবাহের মন্ত্রপাঠের দ্বারা নয়, পরন্তু কঠোর সংযম, তীব্র সাধন এবং গভীর আত্মোপলব্ধির দ্বারা।

বহুদিন যাবৎ ভারতবর্ষ এই সত্যটী ভুলিয়া গিয়াছে। তাই "স্বামী" কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকমাত্রেরই মনে জাগে কতকগুলি অবাচ্য, অশ্রাব্য, কুৎসিত কদর্য্য কথা। কিন্তু নূতন যুগের তপস্বিনী নারীকে নবীন সূর্য্যের অভিনব আলোকে নূতন করিয়া জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডকে পরিস্নাত করিয়া লইতে হইবে, নূতন চক্ষে ধরিত্রীর শ্যাম-শোভা সন্দর্শন করিতে হইবে। ★ ★ ★ ইতি–

শুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

২১শে আষাঢ়, ১৩৩৬

পরমস্নেহভাজিনীষুঃ–

মা, ★ ★ ★ মনে জানিও, তুমি আদ্যাশক্তি মহাকালী, তুমি কৃতান্ত-

ভয়-বারিণী, সর্ব্বশঙ্কাহারিণী, জগজ্জননী, তুমি ব্রহ্মময়ী মা, তুমি ত্রিতাপনাশিনী জগদ্ধাত্রী। মনে জানিও, জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড তোমারই একটা তুচ্ছ ইঙ্গিতের সৃষ্টি। স্থিতি ও লয় তোমারই ভ্রূকুটির অধীন। ক্ষয়োদয়,হ্রাসবৃদ্ধি, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন সব তোমারই অনন্ত-লীলার বিভিন্ন ভঙ্গিমা। নাম জপিবার কালে মনে রাখিও, তুমিই পরমানন্দের খনি ব্রহ্মধাম, তুমিই বেদমাতা সরস্বতী, তুমিই নিখিল জ্ঞান, তুমিই পরমবেদ্য পরমেশ্বর। তুমি নারীও নহ, পুরুষও নহ। নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া যিনি নিজের প্রেরণায় জগৎ চালাইতেছেন, তুমি সেই ব্রহ্ম। তুমি জন্ম-মৃত্যু-জরার অধীনা নহ; তুমি ব্রহ্ম; তুমি সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের অধীনা নহ; তুমি ব্রহ্ম। ব্রহ্মত্বই তোমার স্বরূপ, ব্রহ্মত্বই তোমার স্বভাব।

এই পরমতত্ত্বের উপরে দাঁড়াইয়া, পরমসত্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তোমাকে সংসারের দাঁড় টানিতে হইবে। নৌকার হাল নিজ ব্রহ্মত্বের নির্ভুল উপলব্ধির উপরে সমর্পণ করিয়া ঝড়-ঝঞ্ঝা ভেদ করিয়া বৃষ্টি-বাদল তুচ্ছ করিয়া বজ্রপতনে উপেক্ষা করিয়া, পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গ-রাজির ক্ষুব্ধ আক্রোশের বক্ষ-বিদারণ করিয়া তোমাকে জীবন তরণী চালাইতে হইবে।

পারিবে কি মা ? আমি জানি, তুমি পারিবে। তোমার নিজের বলেই পারিবে, নিজের জ্ঞানেই পারিবে, নিজের চেষ্টাতেই পারিবে। ★ ★ ★ ইতি–

শুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৬

পরমাশীর্ব্বাজিনীষু,

স্নেহের মা, ★ ★ ★ যে কাজে যার যত আনন্দ, সে কাজে তার তত শীঘ্র সিদ্ধিলাভ। যে কাজে যার যত আনন্দহীনতা, সে কাজে তার সিদ্ধিলাভ তত দূর-পরাহত। আনন্দহীন মনে যাহারা দৈনিক পাঁচ ছয় ঘণ্টা করিয়াও ব্যায়াম করে, তাদের দেখা যায়, ব্যায়ামে প্রকৃত উন্নতি কিছুই হয় না। অথচ সানন্দ মনে যাহারা দৈনিক পনের মিনিট করিয়া ব্যায়াম করে, তাদের

দেহশ্রী ছয়মাস এক বৎসরের মধ্যেই সকলের বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভগবৎ-সাধন সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। আনন্দহীন সাধন দীর্ঘকাল ব্যাপীয়া করিলেও তাহাতে সত্যিকার কল্যাণ জাগ্রত হয় না, উহা অনেক সময়ে একটা লোক দেখান ভড়ুং মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। আর আনন্দযুক্ত চিত্তে নিয়মিত ভাবে অল্প সময়ও যদি সাধন করা যায়, তবে দেখিতে না দেখিতে ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণা হইয়া সাধকের অন্তরে পরাভক্তি-রূপে বিরাজমানা হন, তাহার চক্ষে প্রেমস্নাত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ-রূপে এবং বক্ষে নিঃসংশয় অকুতোভয়তা-রূপে অধিষ্ঠিতা হন। তাই সাধনের সহিত আনন্দের অনুভূতিকে নিত্য-সংযুক্ত রাখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। সাধন যাহাতে একদিনের জন্য বা একবারের জন্যও নিরানন্দ ব্যাপারে পরিণত হইতে না পারে, তজ্জন্য প্রতিনিয়ত এই একটী চিন্তা করিবে যে, সাধন আর আনন্দ অভেদ বস্তু, অবিচ্ছিন্ন বস্তু। চিন্তা করিবে, সাধনই আনন্দের উৎস, আনন্দের জনক, আনন্দের আধার। চিন্তা করিবে, সাধনই আনন্দের প্রকাশক, আনন্দের বিস্তারক আনন্দের পূর্ণতা-বিধায়ক। চিন্তা করিবে, সাধনহীন আনন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে নিরানন্দেরই রূপান্তর, বিষণ্ণতারই নামান্তর। এইভাবে নিয়তই সাধনের সহিত আনন্দের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধের কথা নানা ভাবে নানা প্রকারে চিন্তা করিবে। ইহার ফল এই দাঁড়াইবে যে, সাধন করিতে বসিলেই আনন্দের স্মৃতি অন্তরে সমুদ্ভাসিত হইবে।

আরও একটী কাজ করিও। সাধনে বসিয়াই একবার নিজের আনন্দিত হাস্যমুখ কল্পনার নয়নে দেখিয়া লইও। আনন্দের মধ্য দিয়াই জীবন-সুকুম প্রস্ফুটিত হইবে, আনন্দের মধ্য দিয়াই এ ফুল পরমপ্রভুর পায়ে অঞ্জলি দিবার যোগ্য হইবে, আনন্দের মধ্য দিয়াই এই অধোগত জাতির ততোধি অধোগত নারী-সমাজ নিজের উন্নতি, নিজের পূর্ণতা ও নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবে। আজকাল নারীর উন্নতি-মূলক যত প্রয়াস চলিতেছে, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠাত্মক যত চেষ্টা হইতেছে, সবগুলির মূলেই যেন এক বদ্ধমূল বিষাদ রাজত্ব করিতেছে। আনন্দ যেন সে প্রয়াসে নাই, সে যেন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া, সে যেন পুরুষের পাপের রুদ্র প্রতিহিংসা, সে যেন অত্যাচারেরই

প্রত্যুত্তর মাত্র। নারীর এই আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আনন্দের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান করিতে হইবে এবং ব্যাপক আন্দোলন আনন্দেই প্রতিষ্ঠিত হইবে– প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের মধ্যে সাধন-নিষ্ঠার সুপ্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে।

আজ পর্য্যন্ত নারী যাহা হয় নাই, তাহা তোমাকে হইতে হইবে। আজ পর্য্যন্ত নারী-জাতি যাহা করে নাই, তাহা তোমাকে করিতে হইবে। তোমাকে সমগ্র নারী-জাতির মধ্যে এক অভাবনীয় ভাব-বিপ্লব আনয়ন করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রস্তুত হও মা। ★ ★ ★ ইতি–

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী আশ্রম

২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়াসুঃ–

আমার মাকে আমি সহস্ররূপে সহস্র ভাবে সহস্র-নয়নে, সহস্রবার দেখিতে চাই। শুধু একটী রূপের ভাতি লইয়া নয়ন-সমুখে দাঁড়াইলেই মাতৃ-দর্শন-পিয়াসী সন্তানের পিপাসা মিটিবে না। তাঁর জীবনে শুধু একটী ভাবের লীলা-বৈচিত্র্য দেখিলেই আমি তুষ্ট হইব না, বহু যুগ পরে পরে একটীবার করিয়া মা আবির্ভূতা হইলেই আমার আশা মিটিবে না। আমি চাই আমার নিদ্রিতা জননীর চিরজাগ্রত স্ফূর্ত্তি সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার দীপ্তি লইয়া ফুটিয়া উঠুক, মুহুর্মুহু তাঁর মহিমার কেতন পত্ পত্ শব্দে উড্ডীয়মান হইতে থাকুক, মা আমার সকল কল্পনার কুয়াসা ভেদিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে অপরূপ দিব্য কান্তিতে ঝল্‌মল্ করিতে করিতে অবতীর্ণা হউন! আসুন মা তাঁর অজ্ঞান-বিনাশের বেদমন্ত্র লইয়া, আসুন মা তাঁর অসুর-নিপাতের খর-করবাল ধরিয়া। আসুন মা তাঁর স্নেহ-স্নিগ্ধ অমৃতময়ী বাণী লইয়া, আসুন মা তাঁর মৃতসঞ্জীবনী সুধার অফুরন্ত উৎস লইয়া,–এই মৃত ও মুমূর্ষু জাতির দগ্ধপ্রায় ভগ্নাস্থি-পঞ্জরে তিনি তাঁর আশিসের শক্তিতে নবজীবন সঞ্চারিত করুন। আসুন মা দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার নিবারণ করিতে, লাঞ্ছিত অসহায়কে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে, অনাথ আতুরের মুহ্যমান

চেতনা বুকের স্তন্যে সঞ্জীবিত করিতে। আসুন মা আজ পরপীড়ক স্পর্দ্ধিতের উদ্ধত গর্ব্বিত শির নিজ হস্তে স্কন্ধচ্যুত করিতে, আসুন মা আজ ধরণীর বৃথা রক্তস্রোত জীবপ্রীতির বন্যার জলে ভাসাইয়া দিতে। আসুন মা আজ অন্ধের যষ্টি হইয়া, বৃদ্ধের সম্বল হইয়া, তরুণের উৎসাহ হইয়া, কর্ম্মীর বল হইয়া, সাধকের গুরু হইয়া, ক্ষুধিতের অন্ন হইয়া, হতাশের আশা হইয়া, ব্যথিতের নির্ভর হইয়া, পতিতের অভ্যুদয় হইয়া। আসুন মা আজ দিকে দিকে দেশে দেশে মা-মা ধ্বনির সিংহ-গর্জ্জন উত্থিত করাইয়া, আসুন মা আজ নিজের পূর্ণ আবির্ভাবকে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত-ভাবে অনুভব করাইয়া।

আমার সেই মা তুমি। যেই মা আমার ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী, সেই মা-ই তুমি। যেই মা আমার ব্রহ্মাণ্ড-পালিনী, সেই মা-ই তুমি। যেই মা দেশের দুর্ভাগ্য ঘুচাইবে, সেই মা যে তুমি! যেই মা জাতির অশ্রু মুছাইবে, সেই মা যে তুমি! ছোট বড় সকলকে যে মাতৃ-স্নেহ দান করিবে, সকলকে যে বুকের স্তন্যে জীবন্ত করিবে, সকলকে যে অফুরন্ত ভালবাসা দিয়া মানুষ করিবে, সেই মা যে তুমি। তোমারই নিকটে জাতির ভিক্ষা জ্ঞান, জাতির প্রার্থনা শক্তি, জাতির দাবী অখণ্ড-মনুষ্যত্ব।– তারই জন্য মা প্রস্তুত হও।

★ ★ ★ ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

ওঁ ব্রহ্মগুরু পুপুন্‌কী আশ্রম

২৯শে আষাঢ়, ১৩৩৬

স্নেহের মা–,

★ ★ ★ জ্ঞানরাজ্যের অধিকার আমাদের ন্যায় তোমাদেরও অবারিত। তোমরা নারী বলিয়া জ্ঞান আহরণে বাধা দিবার অধিকার কাহারও নাই। জ্ঞানপথে তোমাদের সমক্ষে যত বাধা আসিয়া জুটিয়াছে, তোমরা মা সেইগুলিকে আজ অস্বীকার কর। যত বিঘ্নই জ্ঞানার্জ্জনকে কষ্টকর করিয়া থাকুক না কেন, সিংহ-বাহিনীর বিক্রমে সব-কিছু অগ্রাহ্য কর। জ্ঞান লাভের জন্য আজ উন্মাদিনী হও, জ্ঞানের পরশমণি আজ নারী-সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত করুক।

শিক্ষার যখন সময়, তখনই তোমরা সংসারধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিষয়-ব্যাপারে বিজড়িত হইয়া পড়িতেছ। ইহা তোমাদের জ্ঞান-সাধনার এক অতি প্রবল অন্তরায়। কিন্তু এই বাধাকেও সুকৌশলে এড়াইতে হইবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার শক্তিতে তোমাদিগকে এই বাধাও জয় করিতে হইবে। নিজের বিদ্যানুরাগের দ্বারা স্বামীর বিদ্যানুরাগকে প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে এবং অবিবাহিত অবস্থায় যে জ্ঞানকে অনুশীলন করিতে হইত একাকিনী, বিবাহিত অবস্থায় তাহার অনুশীলন করিতে হইবে সমবেত ভাবে। সংসার-ধর্ম্ম জ্ঞানের বাধা কিন্তু সংসার সত্ত্বেও জ্ঞানলাভ অসম্ভব নহে।

দাম্পত্য জীবনে জ্ঞানের সাধনাকে অধিকতর সহজ ও সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য তোমাদের মধ্যে আরও একটা জিনিষ চাই। তাহা হইতেছে সংযম। তোমাদিগকে প্রাণপণ প্রযত্নে সংযমের শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। যে অসংযমের বিষময় ফলে স্বামি-স্ত্রীর পারিবারিক ভালবাসা একটা কদর্য্য মনোবৃত্তি মাত্রে পরিণত হয়, যার অকল্যাণময় প্রভাবে অবাঞ্ছনীয় সন্তান-সন্ততির দল একপাল শূকরছানার মত প্রাদুর্ভূত হইয়া গার্হস্থ্যমন্দির বিষ্ঠামূত্রে অপবিত্র করে, সেই অসংযমের সকল কারিকুরি তোমাদিগকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে,—অসংযমের বিষদন্ত তোমাদিগকে অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে উৎপাটিত করিতে হইবে। তোমাদের যে প্রেম, তোমাদের যে প্রীতি, তোমাদের যে সুগভীর অনুরাগ, তাহাকে আগে করিতে হইবে কর্পূরের মত শুভ্র, চন্দনের ন্যায় সুরভি, কুঙ্কুমের ন্যায় সুন্দর। তোমাদের দুইজনের যে ভালবাসা, তাহাকে শিশুর হাসির মত অনাবিল পবিত্রতায় মণ্ডিত করিতে হইবে।

ইহা করিবার উপায় ভগবৎ-সাধন। একাকী সাধন নহে, উভয়ে মিলিয়া সাধন, একজনের ভাবের সহিত অপরের ভাবের যোগ রাখিয়া সাধন, একের প্রাণের সহিত অপরের প্রাণের মিল রাখিয়া সাধন।

ভারতবর্ষ মুক্তি চায়, শুধু রাজনৈতিক নহে, সর্ব্বপ্রকার মুক্তি চায়। ভারত আজ সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি চায়, সর্ব্বপ্রকার দাসত্ব হইতে মুক্তি চায়, সকল অকল্যাণকর লৌহশৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া দিতে চায়। ভারতের

এই সুবিশাল মুক্তির কামনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, যদি স্ত্রী তাহার স্বামীর সংযমের শক্তিকে, ত্যাগের শক্তিকে, উৎসর্গের শক্তিকে উর্দ্ধমুখিনী করিয়া দিতে না পারে। এই জন্যই মা এই যুগে তোমাদের এত সমাদর, এত সম্বর্দ্ধনা। * * * ইতি-

শুভাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

ওঁ ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৩০শে আষাঢ়, ১৩৩৬

স্নেহের মা-,

* * * স্বামি-স্ত্রীর জীবনে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠাই নারীজাতির উন্নতির প্রথম সোপান। নারীপুরুষের ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান সত্ত্বেও যে পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও জিতেন্দ্রিয়ত্ব থাকিতে পারে, এই কথা যেদিন শত শত সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত হইবে, সেইদিন আর নারী-জাতিকে রক্তলোলুপা রাক্ষসী বা তপোবিনাশিনী প্রেতমূর্ত্তি বলিয়া কেহ কল্পনা করিতে পারিবে না, সেই দিন আর পুরুষজাতি নারীর প্রতি ভোগলুব্ধ অপবিত্র দৃষ্টিতে তাকাইতে সাহস পাইবে না। ভবিষ্যতের নারী জাতি পবিত্রতার যজ্ঞবেদীতে দাঁড়াইয়া কি ভাবে জগতের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিবেন, তাহা নির্ভর করিবে অনেকটা শুধু তোমাদের ন্যায় তরুণ-তরুণীর দাম্পত্য-জীবনের স্বচ্ছতা ও পরিশুদ্ধতার উপরে। আজ নারী দাসী, পুরুষের কামনার দাসী। লালসার দাসী, কিন্তু সংযমের শক্তিতে সে পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল চিত্ত-বৃত্তিকে আপন প্রভুত্বের প্রভাবে শান্ত করিবে, সংযত করিবে, ধীর, স্থির, অচঞ্চল করিবে। সেই দিন নারী যথার্থই পুরুষের ঈশ্বরী হইবে।

চপলমতি তরুণেরা আজ তাহাদের প্রণয়িনীকে সহস্রবার "প্রাণেশ্বরী" বলিয়া সম্বোধন করিয়া মাতামাতি করিতেছে, কিন্তু প্রাণ যে কাহাকে বলে আর ঈশ্বরী যে কে, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানে না। শুধু অর্থহীন চীৎকার করিয়া তাহারা মোহমত্ত চিত্তের অসার বিকারকেই খুলিয়া দেখাইতেছে, পরন্তু না পারিতেছে চলিতে নিজেদের লক্ষ্য-পথে, না পারিতেছে প্রেমের

প্রকৃত অমৃতকে আহরণ ও আস্বাদন করিতে।

এই যে দুর্দ্দৈব, তাহা ঘুচাইবে মা তোমরা। প্রাণের সাধনায় আজ তোমরা প্রাণবতী হও, নিজ নিজ স্বামীদিগকেও প্রাণ-সাধনায় তোমাদের সহযোগী করিয়া লও। ★ ★ ★ ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

ওঁ ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়াসুঃ–

স্নেহের মা, ★ ★ ★ নারীজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতিতে আমি একান্তই বিশ্বাসী এবং এই জাতির উন্নতি আমার প্রাণের এক মহতী কামনা। কারণ, নারীজাতি না যতদিন পর্য্যন্ত অভ্যুদয়ের হিমাদ্রি-শিখরে আরোহন করিতে পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষজাতির অভ্যুদয় নানা প্রকারে অসম্পূর্ণ থাকিবে।

নারী-জাতির অভ্যুদয়-কামনার আর এক হেতু এই যে, পুরুষ যখন অভ্যুদয় লাভ করে, তখন স্থল-বিশেষে সমাজকে তাহার অভ্যুদয়ের ফলদান না করিয়াও বড় হইতে পারে কিন্তু নারী যখন অভ্যুদয় লাভ করে, তখন স্বেচ্ছায়ই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, তাহার নিজ অভ্যুদয়ের কল্যাণময় প্রভাব সে সমাজের উপরে বিস্তার না করিয়া পারে না। পরমেশ্বর-প্রেম-পিয়াসী পুরুষ বনে গিয়া সমাজ-সংশ্রব পরিহার করিয়া অবস্থান করিতে পারে এবং কি পুরুষ কি নারী, সমাজ-মধ্যবর্ত্তী সকলকেই নিজ সঙ্গ ও সাধনা হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারে কিন্তু নারীর সৃষ্টিই এমন এক বিশেষত্বের মধ্য দিয়া যে, জীবনের প্রায় প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রেই সমাজ-জীবনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বনে গিয়া তপস্যা করিলেও সে একাকিনী থাকিবে না, হয় সঙ্গিনী, নয় রক্ষক লইয়া চলিবে। ফলে, নারী বড় হইলে তার বিকশিত জীবনকুসুমের মধুময় সৌরভ চতুর্দ্দিকে সহজেই ছড়ায়, সহজেই সমাজকে প্রভাবিত করে, সহজেই কল্যাণপুঞ্জ বিতরণ করে।

বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে, সংসারে ও সংগ্রামে সর্ব্বত্র স্বামীর সহচারিণী থাকিয়া নারীরা বড় হইয়াছিলেন। বুদ্ধযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নারীরা বড় হইয়াছিলেন, শঙ্করযুগে নারীরা তন্ত্রসাধক গৃহীর রুদ্ধ কুটীরের অন্ধকারে অন্তঃপুরের নীরব নিভৃতে একাকিনী প্রজ্জ্বলিতা হইয়া একাকিনীই বড় হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবযুগে নারীরা হস্তে করঙ্ক, স্কন্ধে ঝুলি লইয়া ঘরে ঘরে হরিগুণ-গান ছড়াইতে ছড়াইতে বড় হইয়াছিলেন। আর, স্বাদেশিকতার নব অভ্যুদয় যুগে নারীরা কারাবাস, নির্য্যাতন, লোকনিন্দা, প্রিয়-বিচ্ছেদ প্রভৃতিকে বরণ করিয়া লইয়া বড় হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাহা ভারতের আদর্শ যুগ, সেই যুগে নারী কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীতেই আত্মপ্রকাশ করিবেন না, একটী নির্দ্দিষ্ট গতিতেই চলিবেন না, একটী নির্দ্দিষ্ট পথকেই ধরিবেন না, পরন্তু এক এক জন এক এক প্রকারের নিজ নিজ স্বভাবপ্রাপ্ত শক্তিকেই প্রকাশিত করিবেন, এক এক প্রকারে নিজ নিজ পূর্ণতা আহরণ করিবেন, এক এক ভঙ্গীতে নিজ নিজ জীবনের বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইবেন। কেহ স্বামীর প্রতি কার্য্যে সহযোগিতা করিয়া, কেহ ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণের মধ্যে স্বাভাবিক পবিত্রতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দাম্পত্য জীবনের গূঢ় ও গোপনীয় অংশমধ্যেই নিজ সাধনদীপ্ত জীবনের সকল প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়া, কেহ ধর্ম্ম লাভের জন্য, ব্রহ্মদর্শনের জন্য সন্ন্যাসিনী হইয়া, কেহ দেশসেবার জন্য জগৎকল্যাণের জন্য আত্মদান করিয়া নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করিবেন। কেহ কেহ বা একাধিক বিশিষ্টতা দ্বারা নিজ নিজ জীবনকে এমন অকল্পনীয় সৌন্দর্য্যে বিচিত্রিত করিবেন যে, জগৎ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইবে এবং শুধু অনিমিখ নয়নে তাকাইয়া থাকিবে।

কিন্তু নারীর এই যে অভ্যুদয়, তার প্রকৃত মানে হইতেছে, তার চিন্তার ঊর্দ্ধমুখীনতা। গৈরিক পরিলেই বুঝিব না যে, নারী অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে। নির্য্যাতন সহিলেই বুঝিব না যে, নারী বড় হইয়াছে। যখন দেখিব, নারী তাহার চিন্তাকে নীচ জগৎ হইতে ঠেলিয়া তুলিয়া ঊর্দ্ধ জগতে নিতে পারিয়াছে, ছোট বড় সকল কাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে মহচ্চিন্তাকে যুক্ত

করিয়া রাখিতে পারিতেছে, তখনই বুঝিব যে, নারী প্রকৃতই বড় হইয়াছে। চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিলেই বুঝিব না যে, নারী প্রকৃতই বড় হইয়াছে। যখন দেখিব, কৌমার্য্য তার অধোগামিনী প্রবৃত্তিকে ঊর্দ্ধমুখে ঠেলিয়া তুলিবার সামর্থ্য রাখে, তখনই বুঝিব নারী বড় হইয়াছে। সাধক কবি গাহিয়াছেন,-

"ফুল-বাগানে নানা রঙ্গের ফুটিল ফুল।
যে দেখে তার প্রাণ আকুল ॥
সে ফুল অধোমুখী রয়,
কারো ভাগ্যগুণে ঊর্দ্ধমুখী হয়
সেই রসে যার মন মজেছে
লোকে তারে কর বাতুল ॥

যে শক্তি জীবকে অধোমুখে টানিতেছে, তাহাই যখন তাহাকে ঊর্দ্ধে প্রেরণা দিবে, তখন বুঝিব, সে বড় হইয়াছে। যে স্নেহ-ভালবাসা জীবকে জঘন্য স্বার্থপরতায় বাঁধিতেছে, যে প্রীতি-প্রণয় জীবকে ভোগ-সুখের কদর্য্য পঙ্কিলতায় ডুবাইতেছে, তাহাই যখন তাহাকে স্বার্থগন্ধহীন, ভোগ-লিপ্সাতীত নিষ্কামতার জগতে ঠেলিয়া তুলিবে, তখন বুঝিব, সে বড় হইয়াছে। কেহ যখন বড় হয়, তখন বন্ধনের যাহা কারণ, তাহাই মুক্তির সেতুতে পরিণত হয়, লৌহশৃঙ্খল তখন স্বাধীনতার দিকে ঠেলিয়া নেয়।

তোমার দেহের প্রতি মর্ম্মস্থানে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা কে দেখে? তোমার মনের প্রত্যেকটী তরঙ্গে কত শতদল প্রতিনিয়ত ফুটিতেছে, তাহা কে জানে? তোমার সকল সংস্কার, তোমার সকল রুচি, তোমার সকল শক্তি-সামর্থ্য এক একটী পুষ্পের মত গালভরা হাসি লইয়া ফুটিয়াছে এবং ফুটিতেছে, কিন্তু তাহার মুখ যে নীচের দিকে, তার দৃষ্টি যে অধঃপথে, তার লক্ষ্য যে পতনে। এই মুখটীকে ফিরাইতে হইবে, এই দৃষ্টিকে বিপরীত দিকে চালিত করিতে হইবে। অনন্ত উন্মুক্ত উদার আকাশের সূর্য্যকর-দীপ্ত সুনীল আভার প্রতি তোমাকে মুখ ফিরাইতে হইবে, পূর্ণিমা-নিশীথিনীর জ্যোৎস্নাহসিত অভ্রহীন নভোমণ্ডলের পানে তোমাকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে হইবে, যাহার ঊর্দ্ধে কিছুই নাই, তার দিকে

তোমাকে স্থির-লক্ষ্য হইতে হইবে। – ইহাই বড় হইবার পথ।

নারীর বড় হইবার যুগ আসিতেছে কিন্তু সেজন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে, সেজন্য তাহাকে যোগ্যতাসঞ্চয়ে যত্নবতী হইতে হইবে। সকল মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যেই ভিত্তির উপর, সেই ভিত্তি শক্ত করিতে হইবে,– তাহাকে স্বকীয় জীবনে সংযমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহাকে নিষ্কাম, নিষ্কলুষ, দিব্যস্বভাব-সম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে। বড় হইবার জন্য নারীকে ভোগসুখময় সংসারে বাস করিয়াও ভোগে অবিশ্বাস, সুখে অনাস্থা, মোহে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের মসীকৃত আবেষ্টনের মাঝখানে বাস করিয়াও তাহাকে নিত্যানিত্য-বিবেকের জ্ঞানময় সিংহাসনে অবিচলিত চিত্তে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে জগৎপূজ্যা হইয়া সমাসীনা থাকিতে হইবে।

* * * * *

কুমারী অবস্থায় যে নারী কামের কবলিত হয়, সে তার সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ের মূল কুঠারাঘাতে ছিন্ন করে। সধবা অবস্থায় যে নারী কাম-চিন্তার খরস্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দেয়, সে তাহার স্পর্শের দ্বারা নিষ্কলুষ-চিত্ত সহধর্ম্মচারী স্বামীর নির্ব্বিকার মনকে কলুষিত, বিচলিত, বিকার-গ্রস্ত ও ব্রতভ্রষ্ট করে। সন্তান গর্ভে ধরিয়া যে কামচিন্তা করে, সে তার সন্তানের রক্তের সাথে ব্যভিচারের বিষ মিশাইয়া দেয়, সমাজ-ধ্বংসের শ্মশানাগ্নি ঐ ভ্রূণের বুকেই রচনা করে। সন্তান ক্রোড়ে ধারণ করিয়া যে কামচিন্তা করে, তার সন্তান মনুষ্য-জন্মের পবিত্রতার ললাটে পদাঘাত করে, মাতার বক্ষে শেল বিদ্ধ করে, পিতার উন্নত মস্তক লগুড়াঘাতে চূর্ণিত করে, আত্মীয়-বান্ধবকে হেঁটমুণ্ড করে, দেশকে ও জাতিকে বিশুদ্ধ সেবা হইতে বঞ্চিত করে এবং সমাজশরীর গুপ্তবিষে জর্জ্জরিত করে। মোট কথা, কামচিন্তা নারীজাতির বড় হইবার বিষম বিঘ্ন, অভ্যুদয়-পথের তীক্ষ্ণ কণ্টক, উন্নতির বিশাল বাধা। এই কামকে সাধনবলে জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করা এবং ভগবানের প্রেমে সংসারকে মধুময় করিয়া তোলাই নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

কিন্তু কথাগুলি পড়িয়া ভয় পাইয়া যাইও না। সর্ব্বনাশক কামকে সর্ব্বশুভদায়ক প্রেমে রূপান্তরিত করা যায়। সেই উপায় খুব কঠিনও নহে।

★ ★ ★ ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৯)

ওঁ-ব্রহ্মগুরু

কলিকাতা
৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

স্নেহের মা,

★ ★ ★ আমার মতে প্রত্যেক সাধারণ নরনারীর ত' ব্যায়ামচর্চ্চা করা উচিতই, এমন কি যাঁহারা দেশমধ্যে বিভিন্ন জনহিতকর আন্দোলন পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও ব্যায়ামচর্চ্চা দ্বারা নিজ নিজ দেহের গঠনকে সুদৃঢ় ও সুঠাম করা কর্ত্তব্য। তাহার একটী বিশেষ সুফল এই হইবে যে, চিন্তা এবং বিচারের জগতে যাঁহারা মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভার প্রভায় প্রদীপ্যমান, তাঁহারা যখন নিজেদের দেহের মধ্যে সর্ব্ববিধ পৌরুষ এবং তেজস্বিতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন, তখন শারীরিক সুস্থতা অর্জ্জন ও দৈহিক পবিত্রতা পরিরক্ষণের ব্যাপারে তাঁহাদের অনুরাগী, গুণমুগ্ধ ও ভক্তসম্প্রদায়ের মধ্যে বিনা চেষ্টাতেই প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী যদি দৈহিক গঠনে একজন বীর হইতেন এবং নিত্যব্যায়ামাভ্যাসী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভারতব্যাপী আত্মিক শক্তির আন্দোলনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বোধ হয় সহস্র সহস্র ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া এতদিনে লক্ষ লক্ষ ক্ষীণ-দুর্ব্বল-দেহ নরনারীকে বল-লাভে প্রোৎসাহিত করিত। বলিতে হয়, রামমূর্ত্তি বা শ্যামাকান্তের ন্যায় নিত্যব্যায়ামাভ্যাসী বীরগণের দ্বারা দেশমধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলন যতটা শক্তিমান্ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধে লিখিত অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা সকলে মিলিয়াও বোধ হয় ততখানি কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, বক্তৃতার অপেক্ষা দৃষ্টান্তের মূল্য সর্ব্বদাই বেশী হয়।

অধিকাংশ ভারতবাসী শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বরের একজন অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারাও তাঁহাকে একজন অসামান্য মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করেন। এই শ্রীকৃষ্ণের জীবনে আমরা আদর্শবাদ এবং শারীরিক শক্তির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। এক দিকে তিনি কুরুক্ষেত্রের রণ-কোলাহলের মধ্যে বসিয়াও জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানময়ী বাণীর বক্তা, অপর দিকে তিনিই আবার বাহুবলে কংস-নিধনকারী, দুষ্ট-দমনকারী, দর্পীর দর্পহারী। ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরম সত্য অর্জ্জুনের নিকটে বিতরণ করিতে হইয়াছিল বলিয়াই যে তিনি দৈহিক শক্তির অনুশীলন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। একাধারে জ্ঞানার্থীর যেমন তিনি হইয়াছিলেন জ্ঞানগুরু, তেমনি আবার বলার্থীর তিনি হইয়াছিলেন অস্ত্রগুরু এবং শস্ত্রগুরু।

বর্ত্তমানযুগে যাঁহারা লোক-গুরুর পদ গ্রহণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ জীবনের মধ্যে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয়বিধ শক্তির পূর্ণ প্রস্ফুটনে প্রয়াসশীল হইতে হইবে। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করাই লক্ষ্য বলিয়া ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ-প্রার্থীর পক্ষে শারীরিক চর্চ্চা স্থলবিশেষে পরিত্যাজ্য হইতে পারে, কিন্তু দেশকে এবং জাতিকে সেবা দান করা যাহার লক্ষ্য, তাহাকে সমপ্রযত্নে উভয়দিকেই উৎকর্ষবান্ হইতে হইবে, নতুবা তাঁহার অনুসরণকারীরা হয়ত অন্ধ গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমির কবলে পড়িয়া নিজেদের সর্ব্বাঙ্গীন অভ্যুদয়ের সম্ভাবনাকে সঙ্কীর্ণই করিতে থাকিবে।

আমার এই কথাগুলি মহিলা কর্ম্মীদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ভিতর এবং বাহির এই উভয়দিকের পূর্ণতা যাহার মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন মহিলা-শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের দাবী আজ আমরা করিতেছি। দেশ আজ এমন স্ত্রীগুরুও চাহে, যাঁহার দৃষ্টান্তে ও উপদেশে দেশের অন্তরের বল ও বাহিরের শক্তি উভয়ই সমভাবে উদ্বুদ্ধ হইবে, সমভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। এই সেই দিন তারাবাঈ নাম্নী এক মহারাষ্ট্রীয়া মহিলা বুকের উপরে দশ মন ওজনের পাথর ভাঙ্গাইয়া এবং অপরাপর আশ্চর্য্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া দেশকে বিস্মিত করিয়াছেন। এই যে শক্তি, ইহার মধ্যে ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণের ঐশীশক্তি আছে। এই শক্তির সহিত যখন ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর ব্রহ্মজ্ঞান, মৈত্রেয়ীর তত্ত্বজ্ঞান সম্মিলিত হইবে, এই শারীরিক বলের সহিত যখন উভয়-ভারতীর দিব্য প্রতিভার সম্মিলন ঘটিবে, তখনই ভারতবর্ষে মহিলা-শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, একথা বলা চলিবে। দেশ আজ মহিলা-শ্রীকৃষ্ণকে চাহে। কর্ত্তব্যের কঠোরতা দেখিয়া যখন মিথ্যা যুক্তির প্ররোচনায় তত্ত্বজ্ঞানের প্রদীপ নিভিয়া যাইতে চাহে, তখন যেমন এই মহিলা-শ্রীকৃষ্ণের বজ্রনাদী কণ্ঠের অভয়-মধুর প্রসন্ন বাণী চাহে, তেমনি আবার অবসন্ন দেহে শক্তির উদ্বোধন ঘটাইতে, দুর্ব্বল বাহুতে বলের সঞ্চার করিতে, শিথিল মাংসপেশীকে ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ় করিতে, কুব্জ পৃষ্ঠ-বংশ সরল সবল করিতে, ন্যুব্জ দেহ সোজা করিয়া ধরিতে মল্লগুরু, রণগুরু, বীর্য্যগুরু মহিলা-শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা, দীক্ষা ও সস্নেহ অনুশাসন চাহে।

আমি যে মা প্রতি পত্রেই ব্যায়ামের কথাটা তোমাকে অত করিয়া লিখি, তাহার কারণ এই। এই যুগে যে সকল কর্ম্মী মা ভারতের নারীশক্তিকে প্রবোধিত করিবেন, তাঁহাদিগকে ভারতীয় নারীজাতির অন্তর ও বাহির এই উভয় দিকের পূর্ণতা এবং মহিমার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নবযুগের ভারতবর্ষ ব্রহ্মজ্যোতিরুদ্ভাসিত মহিলার প্রদীপ্ত আনন রোগ-ভার-জর্জ্জরিত মেরুদণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে অনিচ্ছুক। নবযুগের ভারত বলবীর্য্যশালিনী সিংহবাহিনী বীর-নারীর স্কন্ধোপরি পাপলালসাবিহ্বল অপবিত্রতালোলুপ পাশব প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি কোনও মুখমণ্ডলকে স্থাপিত দেখিতে চাহে না। দৈহিক বলের সহিত ধর্ম্মের বল, বাহুবলের সহিত আত্মার বল, স্বাধীনতার সহিত সংযম, আত্ম-প্রতিষ্ঠার সহিত পরার্থপরতা, একযোগে একত্র সমাবিষ্ট দেখিলেই আমাদের নয়ন জুড়াইবে।

এই যে দেশব্যাপী অকালমৃত্যু, ইহার প্রকৃত কারণ কি মা? এই যে পথে ঘাটে কঙ্কালসার মৃতপ্রায় নরনারীর শ্রেণী যেন হরিশ্চন্দ্র-ঘাটের শ্মশানাগ্নির আস্বাদন পাইবার জন্যই কে কাহার আগে যাইতে পারে, সেই চেষ্টায় প্রতিযোগিতা করিয়াই অগ্রসর হইতেছে, ইহার হেতু কি? কেন সতীসীমন্তিনী আজ অল্প বয়সেই বিধবা হয়, শিশু-পুত্রের মাতা আজ সন্তান-বিয়োগে অধীর হইয়া বুকফাটা চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করে, কেন আজ

উপার্জ্জনক্ষম যোগ্যপুত্র জীবনের প্রথম বসন্তের মলয় মারুত গায়ে লাগিতে না লাগিতেই বৃদ্ধ পিতামাতাকে শেষ সময়ে দুমুঠা অন্নে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের তপ্ত শেল বিঁধিয়া পরপারের যাত্রী হয়? সে কথা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? কেন আজ মেয়েরা প্রথম সন্তানটি প্রসব করিতে গিয়াই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, কেন আজ দুই তিনটী সন্তানের জননী হইবার পরেই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নারী এক অতি দুর্ব্বল অভিশপ্ত জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহিয়া বেড়ায়, কেন নারী নারীত্বের পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বেই বাসী ফুলের মত ঝরিয়া পড়ে, সে কথা কি কখনও চিন্তা করিয়াছ?

ইহার কারণ অনেক। তন্মধ্যে প্রধান কারণ,

(ক) ব্রহ্মচর্য্যের অভাব,
(খ) ব্যায়ামশীলতার অভাব,
(গ) উপযুক্ত খাদ্যের অভাব,
(ঘ) ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতির ঘন ঘন প্রাদুর্ভাব।

পূর্ব্বোক্ত চারিটী কারণই অত্যন্ত প্রভাব-সম্পন্ন। কিন্তু তন্মধ্যে প্রথম দুইটী কারণকে দূরীভূত করিবার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াস চলিলে তাহারই স্বাভাবিক ফলে পরবর্ত্তী দুইটী কারণ স্থলবিশেষে আংশিকরূপে, স্থলবিশেষে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা সম্ভব হইবে। ইন্দ্রিয়-সংযম ও ব্যায়ামশীলতা প্রতিষ্ঠিত হইলে অল্প খাদ্যে দেহের বেশী পুষ্টি হইবে, উৎকৃষ্ট খাদ্য সংগ্রহ অসম্ভব হইলে নিকৃষ্ট খাদ্যের মধ্য হইতেও সবটুকু সার দেহমধ্যে পরিগ্রহণের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইবে, রোগপ্রবণতা হ্রাস পাইবে, বহিরাগত রোগকে প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য বাড়িবে, ফলে অকালমৃত্যু নিবারিত হইবে। মোটের উপর ব্রহ্মচর্য্য ও ব্যায়াম আমাদের জাতির ধ্বংস-নিবারণের দুইটি অমোঘ অস্ত্র এবং এই দুইটি শাণিত কৃপাণ দৃঢ়-করে ধারণ করিয়া কর্ম্মী-মা-দিগকেও নারীজাতির অভ্যুদয়ের শত্রুগুলির শিরশ্ছেদন করিতে হইবে।

হে মা, আজ তোমরা বীর্য্যবতী হও, বলশালিনী হও, আজ তোমরা জ্ঞানের বলে ভিতরের অসুরকে নিপাত করিবার সামর্থ্য অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাহুর বলে বাহিরের অসুরের পাপলীলার অবসান ঘটাইতে শিক্ষা কর। অজ্ঞানান্ধ

নারীজাতির তিমিরাবৃত চক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের অঞ্জন মাখিতে ব্রতী হইয়াছ বলিয়া মনে করিলে চলিবে না, ইহাদের দৈহিক অধঃপতনকে ঔদাসীন্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া গেলে চলিবে না। মূক নারীজাতির মুখে কথা ফুটাইবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া মনে করিলে চলিবে না যে, ইহাদের দুর্ব্বল বাহুকে সবল করিতে না পারিলে তোমার ব্রত সম্পূর্ণরূপে উদ্‌যাপিত হইবে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার, স্ত্রীজাতির মধ্যে ত্যাগ-নিষ্ঠা, সেবাপরায়ণতা ও ধর্ম্মিষ্ঠতা বর্দ্ধনই তোমার ব্রতের সবটুকু নয়, ইহাদের অবশ দেহ স্ববশ করিতে হইবে, ইহাদের নির্বল বাহু সবল করিতে হইবে, ইহাদের রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখমণ্ডল স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে নবশোণিত-প্রবাহের জ্যোতিতে হাস্যময় ও উজ্জ্বল করিতে হইবে। তারই জন্য তোমার মতন সাধন-ভজন-পরায়ণা নিয়ত-ব্রহ্মানুধ্যান-তৎপরা যোগিনী-মাকেও আমি ব্যায়াম-সাধনায় বারংবার প্রেরণা দিতেছি। * * * ইতি-

শুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ

(৩০)

ওঁ ব্রহ্মগুরু কলিকাতা

১৯ শ্রাবণ, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

স্নেহের মা, নারীজাতির মধ্যে শক্তির চর্চ্চাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই তোমাদিগকে এমন একদল মহিলা-মল্ল গড়িতে হইবে, যাহাদের বাহুতে থাকিবে অমিত শক্তি, হৃদয়ে থাকিবে অসীম সাহস, বক্ষে থাকিবে জাতীয় উন্নতির সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, মনে থাকিবে প্রবল আত্মবিশ্বাস, চিত্তে থাকিবে অসামান্য সংযম, আর চরিত্রে থাকিবে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা। জীবনকে ইহারা ভগবৎ-সাধনার সুগভীর অনুভূতির উপরে ভিত্তিমান্ করিবে এবং ভগবৎ সাধনার বীজ হইতেই ইহাদের জীবন-ব্যাপী কল্যাণ-সাধনার সুদূর-প্রসারিণী শাখা ও প্রশাখা-সমূহ উদ্গত হইয়া জাতিকে স্থায়ী এবং সত্য মঙ্গল বিতরণ করিবে। এই সকল মহিলা-মল্লের ভিতরে কুমারী থাকিবে, সধবা থাকিবে, বিধবা থাকিবে। কিন্তু প্রত্যেকেরই জীবনের বিশেষত্ব এই হইবে যে, প্রত্যেকে ইহারা শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাইয়া

ধন্য হইবার জন্যই প্রত্যেকটী শ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিবে। ভগবানকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করাই ইহাদের সকল ব্রতের প্রথম কথা হইবে, ভগবানই ইহাদের জীবনের জীবন এবং মরমের মরম হইবেন, ভগবানেরই কাজকে ইহারা নিজেদের করণীয় এবং ভগবানেরই ভাবনাকে ইহারা নিজেদের ভাবনীয় করিয়া লইবে।

নারীর বলচর্চ্চার মূলদেশে যদি ভগবৎ-সাধনায় ফাঁকি থাকে, তাহা হইলে সেই বলচর্চ্চা ভারতের দুঃখ-দুর্গতি বিদূরণে সমর্থ হইবে না। সার্কাসের খেলোয়াড়দের মত বাহিরের লোকের করতালি সংগ্রহ করিবার জন্য যদি নারী নানা প্রকার শারীরিক কৌশল ও শক্তিমত্তা অর্জ্জন করে, শুধু বলের জন্যই যদি সে বল-সঞ্চয় করে, তাহা হইলে তাহার সবল পেশল বাহু-লতা দেহের শ্রেষ্ঠ কল্যাণকে আলিঙ্গন দিয়া ধরিতে সমর্থ হইবে না। ভগবৎ-সেবা যদি তাহার সকল বলের উৎস না হয়, তাহা হইলে এই বল জাতিকে সবলতা উপহার দিতে চাহিয়া মন ও বুদ্ধির অগোচরে নিরন্তর শুধু দুর্ব্বলতারই কারণসমূহ দেশ ও জাতির স্কন্ধের উপরে পসরা ভরিয়া চাপাইয়া দিবে। এই জন্যই ইহাদের সকল প্রয়াসের মূলদেশে চাই আত্মোপলব্ধির সুতীব্র প্রেরণা, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভের আবেগময়ী অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

এই সকল মহিলা-মল্ল কি করিবে ? দল বাঁধিয়া কি সহরে সহরে শরীর-চর্চ্চার উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবে ? না, নিশ্চয়ই না। বাহিরের জগতের কৌতূহল চক্ষু আর বহুপ্রলাপী রসনার সংস্পর্শে তাহারা যাইবে না। বাহবার লোভে বা প্রশংসা-লাভের লালসায় তাহারা চিত্তের প্রশান্তি হারাইয়া সহস্র দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য নিজেদের দেহ-লাবণ্য ও কলাকৌশল রঙ্গমঞ্চের উপরে উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইবে না। কিম্বা বায়োস্কোপের ফিল্মে নিজেদের ক্রীড়া-নৈপুণ্য চিত্রিত করিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহান্বিতা হইবে না। যে শক্তি তাহারা সঙ্গোপনে সাধনায় লাভ করিবে, যে বীরত্ব তাহারা বর্ষের পর বর্ষ একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ে ব্যায়ামের অনুশীলনে অর্জ্জন করিবে, তাহা তাহারা সঙ্গোপনেই নিজেদের মধ্যে সযত্নে রক্ষা

করিবে, পরিবর্দ্ধিত করিবে এবং সঙ্গোপনেই সমগ্র নারীজাতির মধ্যে ছড়াইয়া দিতে থাকিবে। বাহিরের প্রদর্শনীর দ্বারা কাহারও চখে তাক্ লাগাইয়া দিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা না করিয়া নিজেদের আয়াস-সঞ্চিত বীরত্বের রত্ন-ভাণ্ডার বক্ষোবিলগ্ন বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া তাহারা সমাজের সর্ব্বস্তরের নারী-সমাজ বিতরণ করিতে থাকিবে। এমন কি একান্নবর্ত্তী পরিবারের কুলবধূ থাকিয়াও তাহারা তাহাদের এই বীরত্বের ব্রত হইতে স্খলিতা হইবে না, আমৃত্যু তাহারা সঙ্গোপনে ব্যায়ামের অনুশীলন করিবে এবং সখী বা মাতৃস্থানীয়া হইয়া প্রেম ও স্নেহের দ্বারা হৃদয় জয় করিয়া লইয়া সমবয়সিনী বা বয়ঃকনিষ্ঠা অপরাপর নারীদিগের মধ্যে বলচর্চ্চার মন্ত্র ছড়াইয়া যাইবে। আলস্যপরায়ণাকে তাহারা নিরালস্য করিবে, স্বাস্থ্যে উদাসীনাকে তাহারা শরীর-রক্ষণে যত্নবতী করিবে, কামুকীকে তাহারা ব্যায়ামের দ্বারা কামদমনে প্রণোদিতা করিবে, রোগ-শীর্ণা নারীকে তাহারা নিয়মিত শরীর-সঞ্চলনে অভ্যাস-শালিনী করিয়া রোগমুক্তা ও স্বাস্থ্যপুষ্টা করিবে। এজন্য তাহাদিগকে খুব উচ্চৈঃস্বরে বড় বড় সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে হইবে না, তাহাদিগকে সকলের সহিত প্রাণটা খুলিয়া মিশিতে হইবে এবং নিজেদের চরিত্রের শক্তি দিয়া, ভগবৎ-সাধনার দিব্য প্রভাব দিয়া সকলের হৃদয় জয় করিতে হইবে। এই যে হৃদয় জয়, ইহার সহায়তায় যাহা অকল্পনীয়, অভাবনীয়, অসম্ভব, তাহাও সম্ভব করা যাইবে।

পুস্তক পাঠ করাইয়া ব্যায়ামের জন্য সত্যিকার আগ্রহ কখনও সৃষ্টি করা যায় না, সত্যিকার আগ্রহ সৃষ্ট হয় দৃষ্টান্তের অলঙ্ঘনীয় শক্তিতে। পুস্তক পাঠে চিন্তাশক্তিই মাত্র উদ্দীপিত হয়, পরন্তু সেই চিন্তা কার্য্যে পরিণত হয় গিয়া দৃষ্টান্তের অসামান্য প্রভাবে। নারী-জাতির মধ্যে ব্যায়াম-সাধনার প্রবর্ত্তন যে আজ বাস্তবিকই আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে, সকলের মনের মধ্যে একথা পুস্তকাদির প্রচারের দ্বারা জাগান যাইতে পারে কিন্তু সেই চিন্তাটাকে কার্য্যে রূপান্তরিত করিবার পক্ষে সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তই সমধিক ফলপ্রদ হইবে। স্থলবিশেষে মেয়েদের জন্য মল্ল-বিদ্যালয়ও স্থাপন করা আবশ্যকীয় হইবে।

ব্যায়াম করিলে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য কমিয়া যায়, বুদ্ধিবৃত্তি স্থূল হয়, এইরূপ এক ভ্রান্ত বিশ্বাস জনসমাজে প্রচলিত আছে। অনেক লোকে মনে মনে এইরূপ বিশ্বাসও পোষণ করে যে, বলশালিনী হইলে স্ত্রীলোক পুরুষের প্রতি অবজ্ঞাশীলা, পত্নী পতির প্রতি ভক্তিহীনা, ভগ্নী ভ্রাতার প্রতি স্নেহহীনা, কন্যা পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীনা হইয়া থাকে। এই সকল বিশ্বাসের যে অর্দ্ধকপর্দ্দকও মূল্য নাই, এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্যও আজ স্ত্রীলোকদের মধ্যে ব্যায়ামাভ্যাসের প্রবর্ত্তনা আবশ্যক।

আমি ত' প্রতিনিয়ত এই কামনাই করিতেছি যে, অনাত্মীয় কোনও পুরুষ দেখিলেই যে আজ স্ত্রীলোকের বুক সম্ভ্রমনাশের আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে, তাহার কারণ এই মুহূর্ত্তেই ভারতবর্ষ হইতে চিরতরে বিদূরিত হউক। দেহের এবং মনের যে দুর্ব্বলতাবশতঃ প্রাণ থাকিতে সতী সাধ্বীর অঙ্গে পাপাত্মা পশু হস্তক্ষেপ করিতে পারে, আমি ত' চাহি, সেই দুর্ব্বলতা অবিলম্বে নিঃশেষে ধ্বংস-প্রাপ্ত হউক। কুচক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে বলবান্ শয়তানের চক্ষুর্দ্বয় যাহারা স্বহস্তে কোটর হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারে, কুকথা উচ্চারণ করিলে বলদর্পিত লম্পটের চঞ্চল রসনাটাকে যাহারা স্বহস্তে টানিয়া আনিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে, আমি ত' চাহি, সেই সকল ত্রিভুবন-বরেণ্য মায়ের দল আজ গৃহে গৃহে আবির্ভূতা হউন। তাঁহারা আজ দানব-দলনীয় অপরূপ মূর্ত্তিতে সাজিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান, আমরা "জয় মা" "জয় মা" রবে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া বজ্রনির্ঘোষে একবার মুক্তকণ্ঠে মাতৃ-বন্দনা গাহিয়া প্রাণের চির-পোষিত সাধ মিটাই। ইতি—

শুভাশীঃ
স্বরূপানন্দ

(৩১)

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে — কলিকাতা
৭ই ভাদ্র, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়াসুঃ-

পাগ্‌লী মা, তোর পত্রখানা পাইলাম। পাগ্‌লী মা তার পত্রের ছত্রে ছত্রে নিজের যে ভুবন-ভুলান রূপ প্রকাশিত করিয়াছে, সে দৃশ্য অন্তরের

চখে একবার দেখিলে সন্তানের জন্ম সার্থক হইয়া যায়।

তোরাই ত' মহাশক্তির পরমকারণী পরমেশ্বরী, তোরাই ত' মা জগদানন্দবিধায়িনী জন্মদাত্রী জগদ্ধাত্রী। চিরসুন্দর পরব্রহ্মের

তোরাই হাসি, তোরাই গান,
তোরাই হৃদয়, তোরাই প্রাণ।

–ভগবানকে আমি বুকের মাঝে পাই যে মা তোদেরই পাদপদ্মের রেণুর মধ্য দিয়া।

লৌকিক হিসাবে আমি তোর গুরু, তুই আমার শিষ্যা, তাই "পাদপদ্ম" কথাটার উল্লেখ দেখিয়া আতঙ্কে হয়ত শিহরিয়া উঠিবি। কিন্তু কথাটা ভয়েরও নয়, বিপদেরও নয়। তোদের মত পাগ্‌লী মা-দের পাদুটাকে বড় করিয়া দেখিতে পারিয়াছি বলিয়াই না যেই আমি এক সময়ে ব্রতাবলম্বী হইয়া স্ত্রীলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়াছিলাম,–স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলা বা তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনাদি করা ত' দূরেরই কথা, সেই আমি আজ অহর্নিশ শুধু এই এক চিন্তাতেই উন্মত্তের ন্যায় কাল-যাপন করিতেছি যে,–

কবে জাগ্‌বেরে মা আমার
দানব-মুণ্ড করিয়া ছিন্ন
ঘুচাবে ধরার ভার।

তোদের পায়ের এক কোণাতে আমি নিজের প্রাণের সকল কোমল কুসুমকলি শ্রদ্ধাভক্তির চন্দনকুঙ্কুমে চর্চ্চিত করিয়া অঞ্জলি দিয়াছি বলিয়াই তোদের কথা ভাবিবার, তোদের সাথে নিঃসঙ্কোচে কথা কহিবার, তোদের কাছে নির্ভয়ে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবার অধিকার পাইয়াছি। তোরা যে আমায় ছেলে বলিয়া আদর করিস্, সন্তান জানিয়া ভালবাসিস্, সেকি মা শুধু শুধু? তোদের মুখের পানে তাকাইবার আগে তোদের পায়ের পানে তাকাইয়াই আমি তোদেরকে মা বলিয়া চিনিতে পারি, তার মূল হইল তোদের পায়ের আশীর্ব্বাদ।

মায়ের স্নেহের একটী কণায়
বিশ্বভুবন জয় করা যায়।

একটী সীমায় মনকে নিবদ্ধ করিয়া অসীমে যাইবার চেষ্টাকে অনেকে নিন্দা করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া গালি দিয়াছেন। আমি কিন্তু মা, পুতুল-পূজাই আরম্ভ করিয়াছি। সে পুতুল মানুষের গড়া নয়, কিম্বা আমার কল্পনায়ও রচা নয়। যে পুতুল স্বভাবের গড়া, বিশ্ববিকাশের চিরন্তনী ধারায় যে পুতুল আপনি আসিয়া নয়নের সুমুখে দাঁড়ায়,– সে পুতুল তোরা। জীবন্ত পুতুল আসিয়া আমাকে সম্বোধন করে, আমি পরব্রহ্মকে ঐ পুতুলের মধ্যে সমাবিষ্ট দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হই, সেই পুতুলকে আমি আমার ইষ্টনাম ধরিয়া ডাকি, সেই পুতুলের আমি ধ্যান করি, সেই পুতুলের তেজে, শক্তিতে, মহিমায়, ঐশ্বর্য্যে, মাধুর্য্যে, জ্ঞানে ও জ্যোতিতে আমি জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড উদ্‌ভাসিত দেখি।

পুতুল শুধু নয়কো পুতুল,
প্রাণ যে আছে তার,
প্রাণের মাঝে জ্ঞানের বাতি
ঘুচায় অন্ধকার।

বর্ত্তমানে নারী তার নিজ মহিমার দীপ্তি হইতে বঞ্চিতা হইয়া রহিয়াছে শুধু তার সর্ব্বতোমুখী মাতৃত্বের জ্ঞানাভাবে। নিজেকে সে নারী ভাবে, নিজেকে সে নারীই জানে, মা বলিয়া জানে না। জগতের যে দিকে যাকে দেখা যায়, সেই যে তার সাথে মাতৃত্বের সম্বন্ধে সম্পর্কান্বিত, এই সুপবিত্র ধারণা তার কুসংস্কার-দুষ্ট মনে স্থান পায় না।

স্তনের সুধা যায় শুকায়ে
ভোগের বিলাসে,
নূতন জীবন দেয় না ত' সে,
প্রাণ যে বিনাশে।

নারীর এই অক্ষমতাকে আমরা ঘুচাইব আমাদের সন্তানত্বের অকপটতা দিয়া, আমাদের মাতৃবুদ্ধির অনাবিলতা দিয়া। ইট-কাঠ-পাথরকে আমরা প্রাণভরা মা ডাক দিয়া জাগাইয়া তুলিব। ইহা যদি করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের পুরুষ হইয়া জন্মিবার পরিপূর্ণ সার্থকতা প্রমাণিত করিতে পারিব।–পুরুষের গৌরব তার সন্তানত্বে।

গভীর ডাকে জাগায় মাকে
সেই ত' মায়ের ছেলে,
মোহের তন্দ্রা দেয় ঘুচিয়ে
প্রাণের আগুন ঢেলে।

পাগ্‌লা ছেলেদের আকুল আহ্বানে সাড়া দিবার যোগ্য হইবার জন্য নারীজাতিকে প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আত্মগঠন করিতে হইবে। এই যে আত্ম-প্রস্তুতি, ইহাই সকল সত্যিকার নারী-আন্দোলনের প্রাণবস্তু। চতুর্দ্দিকে আজ যত নারী-আন্দোলনের রব শুনিতেছ, তাহার মধ্যে মাতৃত্ব-বোধের অভাব যেখানে যতটুকু আছে, সেখানে উহা তত প্রাণহীন জানিও।

কিন্তু মা হওয়ার মানে কি ? কোনও ক্রমে গর্ভধারণ করিয়া প্রসূত সন্তান কোলে লইলেই কি কেহ মা হইল ? এমন কোনও কথা নাই। মা হওয়ার লৌকিক অর্থ ধরিলে চলিবে না। মা হওয়ার জন্যই নারীর জন্ম কিন্তু এই মা যে তাহাকে দৈহিক অর্থেই হইতে হইবে, এমন নহে। নিঃসন্তানাও সে হইতে পারে, চিরকুমারীও সে রহিতে পারে, তাহাতে মাতৃত্বের ব্যাঘাত হইবে না। সে মা হইবে তার মনের দিক্ দিয়া, চিত্তের প্রসারের দিক্ দিয়া, হৃদয়ের উদারতার দিক্ দিয়া। সে মা হইবে, যে তার গর্ভজাত সন্তান নয় তাহাকেও সন্তান বলিয়া জানিয়া। সে মা হইবে, পরিচিত অপরিচিত সকলের মুখপানে মায়ের সাহস লইয়া, মায়ের সম্ভ্রম লইয়া, মায়ের শক্তি লইয়া, মায়ের দৃষ্টি লইয়া তাকাইবার ক্ষমতার দ্বারা। যে প্রকৃত মা হইবে, জগতের সকল মিথ্যা চিন্তা তার কাছে আসিয়া পক্ষাঘাতে স্তম্ভিত হইবে, যে প্রকৃত মা হইবে, তাহার সংস্পর্শে আসিয়া দৈত্যদানবের আস্ফালন থামিয়া যাইবে, পিশাচের পৈশাচিকতা, নীচাত্মার নীচতা নিমেষে অপসারিত হইবে।

নারী আজ জগতের সমক্ষে দাঁড়াইবে তার মহিমোজ্জ্বল মাতৃত্বের শ্লাঘা লইয়া, তার পালনী ও শাসনী শক্তি করযোগে ধারণ করিয়া, তার সৃজনী ও নাশিনী প্রতিভার জ্যোতিঃ ত্রিনয়নে জাগ্রত রাখিয়া। তাঁর আজ আবির্ভাব প্রয়োজন শ্রীভগবানের সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, "যখন ধর্ম্মের

গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি সাধুজনের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" তার আজ আবির্ভাব প্রয়োজন, শুম্ভ-নিশুম্ভ-বিনাশিনী রক্তবীজ-বিঘাতিনী রণচণ্ডিকার সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, -"যখন যখন দানবের উৎপীড়নে বসুমতী পীড়িতা হইবেন, তখন আমি অসুর-নিপাতের জন্য আবির্ভূত হইব!"

আজ মায়ের আবির্ভাবের জন্য আকুল প্রতীক্ষাই আমার ব্রত। আমরা আজ মহিষাসুরমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী মাকে চাই, মায়ের অভয় চাই, মায়ের আশিস চাই, মায়ের সান্ত্বনা চাই, মায়ের প্রসন্নতা চাই। ★ ★ ★ ইতি-

সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৭ই ভাদ্র, ১৩৩৬

স্নেহের মা,-
পরমকল্যাণীয়াসু-

পরমকল্যাণীয়া মা শ্রীমতী সু-তোমার নিকটে পত্র লিখিতেছে। তাহার সহিত পত্র ব্যবহারের দ্বারা তুমি তোমার প্রাণের উন্নতিমুখিনী আকাঙ্ক্ষাগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়া লইতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিও।

সু-সধবা, চিরকুমারী নহে, সম্প্রতি কিছুকাল হয় তাহার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু এই কারণে তুমি তাহাকে তোমার ভগিনী হইবার অনুপযুক্তা মনে করিও না। সু-'র ভিতরে জ্ঞান আছে, বিবেক আছে, বৈরাগ্য আছে, সর্ব্বোপরি ভগবন্নামে অবিচলিত বিশ্বাস আছে। যাহার এই সকল গুণ আছে, সে কুমারী হউক, অকুমারী হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

যে সকল পুরুষ সাধনোজ্জ্বল জীবন যাপন করিবার জন্য গৈরিক ধারণ করিয়া সন্ন্যাস নেয়, তাহাদের অনেকের মধ্যে সাদা কাপড়ের উপরে একটা তীব্র অনাস্থা এবং ঘৃণার ভাব দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে অনেকে সাদা-কাপড়-পরা মহাযোগীশ্বরকেও নিজেদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও হেয় জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। বলাই বাহুল্য, এই রকমের মনোবৃত্তি সাধন-

পথে অগ্রগমনের প্ররম বিঘ্ন। ইহার ফলে দর্পদম্ভ সাধকের অন্তর অধিকার করে এবং ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি কোমলবৃত্তিগুলিকে অনাহারে শুষ্ক করিয়া হত্যা করে।

নারী-জাতির মধ্যেও ত্যাগ-ব্রত-ধারিণী তপস্বিনী মা-দের আবির্ভাবের দিন আসিতেছে। তোমাদের মধ্যে তাহার লক্ষণ পরিস্ফুট হইতেছে। তোমাদের কিন্তু মা মনে রাখিতে হইবে যে, ত্যাগব্রত ধারণ করা আর ত্যাগের অহঙ্কার পোষণ করা, এক কথা নয়। তোমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের দুঃখ-দুর্দ্দশা-পীড়িত অধঃপতিত অবস্থার যাঁহারা পরিবর্ত্তন সাধন করিবেন, তাঁহারা শুধুই গৈরিক-ধারিণীর দল নহেন, কিম্বা শুধুই গার্হস্থ্যাবলম্বনকারিণীরাও নহেন। সধবা, বিধবা, কুমারী প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থায় মহিলারা সমবেত-প্রযত্নে আত্মোৎসর্গ করিয়া দীন পতিত ভারতকে তুলিবেন। ভারতের এই মহা-অভ্যুদয়ে তাঁহারা প্রত্যেকেই যে চরিত্র সৌরভে অতুলনীয় মনোরম এবং সতীত্বের ঔজ্জ্বল্যে অনুপম সুন্দর জীবন-সম্ভার দিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া আনিবেন, এইটুকু হইবে তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

ভাল আছি। কুশল-সংবাদে সুখী করিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৪ই ভাদ্র, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়াসুঃ—

স্নেহের মা, * * * তোমার সবগুলি পত্রই পাইয়াছি। তুমি তোমার প্রাণের সচ্চিন্তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলির দ্বারা যদি তোমার সবগুলি সঙ্গিনীকে প্রভাবান্বিতা করিয়া তুলিতে পার, তবেই আমি বুঝিব যে, সত্যই উচ্চাকাঙ্ক্ষা তোমার মধ্যে অবিচলিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বৈদ্যুতিক শক্তি যাহার ভিতরে ক্রিয়া করে, তাহার সংস্পর্শে আসিলে অপর সকলের মনেও নবপ্রেরণা, নবচেতনা, নব-জাগরণ সঞ্চারিত হয়।

পরশমণির স্পর্শে
তাম্র, লৌহ হয় সুবর্ণ
নবজীবনের হর্ষে।

তুমি জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মিণী, তোমার আদর্শ আত্মত্যাগ, তোমার ব্রত পরার্থে জীবনোৎসর্গ। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, এই ব্রত-সাধনা সিদ্ধ হইতে পারে না, যদি সাধন-বলে চিত্তপ্রবৃত্তিগুলি নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ সুবিশুদ্ধ রাখিতে না পার। ত্যাগ যাহার ব্রত, তাহার জীবন-ভিত্তির রচনা আরম্ভ হইবে ভগবৎ-সাধনার উপর।

শিবের বুকে দাঁড়ায় যে, তার
পতন হয় না কভু;
খাঁড়ার ঘায়ে অসুর মারে,
নিজেই নিজের প্রভু।

'শিবের বুক মানে', 'ভগবৎ-সাধনা'।

ভগবৎ-সাধনার গভীরতাই তোমাকে তোমার উপযুক্ত অনুকূল অবস্থা এবং উপযুক্ত সহকর্ম্মিণীগণকে জুটাইয়া দিবে। এই সকলের জন্য মা পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। একান্ত মনে নিজেকে নামের স্রোতে ভাসাইয়া দিলে, ভগবানের নামের প্রবাহে আত্ম-সমর্পণ করিলে, সেই স্রোতই তোমাকে সকল আনুকূল্য দিবে এবং সকল সহযোগিনীগণের নিকট ভাসাইয়া নিয়া যাইবে।

সে-ই হইতেছে সিদ্ধ-যোগিনী, যার নামের স্রোত কখনও থামে না, সকল কর্ম্মে, সকল প্রয়াসে, সকল বহির্ম্মুখ আচার-ব্যবহারেও যাহার ভগবন্নাম-নিষ্ঠা দ্রবীভূত হয় না, শ্বাস-বায়ু যেমন অবিরত চলে, নাম-সাধনও তেমন তার অবিরত চলে। যখন তুমি চক্ষু দ্বারা কোনও দৃশ্য দর্শন কর, তখন কি শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয়? যখন তুমি কাজ কর, তখন কি শ্বাস-প্রশ্বাস থামাইয়া দিতে হয়? যখন তুমি বই পড় বা চিন্তা কর, তখনও শ্বাস-প্রশ্বাস আপনিই চলিতে থাকে। যখনই তুমি কাজ কর না কেন, শ্বাস-প্রশ্বাসের বিরাম নাই। ঠিক তেমনি নাম যখন সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে অবিরাম স্রোতে, অবিশ্রাম গতিতে চলিবে, তখনই তুমি সিদ্ধ-যোগিনী।

সাধন করিতে হইলে কর্ম্ম-বিমুখ হইতে হয়, ইহা মিথ্যা কথা। সত্যিকার সাধন কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেও চলে। সাধন-ভজনের ওজুহাতে অনেক মোহগ্রস্ত নরনারী কর্ম্ম-পরাঙ্মুখ হইবার সুযোগ অন্বেষণ করে। কিন্তু সিদ্ধ-যোগিনীর উহা লক্ষণ নহে।

তোমার সাধনের ঐকান্তিকতাই তোমার জগৎ-কল্যাণী আকাঙ্ক্ষা-সমূহকে জয়যুক্ত করিবে।

নাম তপস্যার সার জগৎ-কল্যাণে
মৌন ইচ্ছা মূর্ত্ত করে পরাণে পরাণে।

মুখে কাহাকেও একটী কথা না কহিয়াও যদি প্রাণে-মনে নামের সাধন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার নীরব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কর্ম্মিণী মায়েরা আসিয়া তোমার হাতে হাত মিলাইবেন, তোমার কাঁধে কাঁধ মিলাইবেন। সত্যই যাহারা তপস্যা করে, তাহাদের জগৎ-কল্যাণী আকাঙ্ক্ষার একটী ক্ষীণতম রেখাও বৃথা যাইবে না। যাহা তোমার মনোমধ্যে রহিয়া একাকিনী তোমাকেই মজাইয়াছে, তাহা কোটি কোটি মনে সংক্রামিত হইয়া জগজ্জোড়া এক বিপুল কর্ম্মোল্লাসের সৃষ্টি করিবে।

জগৎকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার জন্য তোমরা আবির্ভূতা হইয়াছ। কিন্তু এই ভাঙ্গা-গড়ার শক্তি আসিবে রসনা হইতে নহে, আত্মার অভ্যন্তর হইতে। শত কথা কহিলেও, নাট্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া গলা চিরিয়া ফেলিলেও কেহ অতপস্বিনীর কথায় কাণ দিবে না,—সাধনশীলা হইলে তোমার মৌন আবেদনই বিদ্রোহীর হৃদয় গলাইতে সমর্থ হইবে।— জগৎ-কল্যাণ তপঃসাধ্য, বাক্য বল-সাপেক্ষ নয়।

দৈনন্দিন জীবনের কোনও অংশে বা কোনও অবস্থায়ই ভগবানকে না ভুলিয়া, তাঁহার অমৃত রসসিক্ত সুমধুর নামের সুস্বাদ গ্রহণে বিরত না হইয়া পথ চলিতে থাক, গহন অরণ্য আপনি সরিয়া পথ করিয়া দিবে, সমুদ্র-বারি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পথ করিয়া দিবে, হিংস্র পশু লাঙ্গুল দোলাইয়া সানন্দে বশ্যতা স্বীকার করিবে, যমদূত ভয়ভীত-চিত্তে যুক্ত-করে কৃপা ভিক্ষা করিবে।—তপস্বিনী আত্মজয়িনী, তাই সে যমজয়িনী, তাই সে বিশ্বজয়িনী।

যে কর্ম্মকেন্দ্রে এখন শ্রীপ্রভু তোমাকে নিয়া রাখিয়াছেন, সেখান হইতেই তুমি তোমার নব-সৃষ্টির আনন্দময়ী লীলা আরম্ভ কর। মুখের উপদেশ নহে, জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া, প্রাত্যহিক কার্য্যাবলি দেখাইয়া তুমি তোমার সমীপবর্ত্তিনীদের হৃদয়কে আকুল কর, চিত্তকে আকৃষ্ট কর। তোমার পবিত্রতার প্রভা, সাধনের প্রভা, ভগবদ্-বিশ্বাসের প্রভা ইহাদের মনের গোপন অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া ইহাদের প্রচ্ছন্ন সুখ-লালসার ধ্বংস-সাধন করুক, ইহাদের প্রাণ-মন শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য ব্যাকুল বিহ্বল হউক,—পৃথিবী ব্যাপিয়া আজ ত্যাগের মহোৎসব লাগিয়া যাউক।

হে পুত্রী, অগ্রসর হও। পিছন পানে তাকাইও না মা, আগাইয়া যাও। নামের অমৃত পান করিবার জন্য উধাও হইয়া ছুটিয়া যাও। জগতেরই কল্যাণের জন্য তোমাকে নামের মহামধু আকণ্ঠ পান করিতে হইবে, সেই মহামধু পরমকল্যাণী অভয়-দৃষ্টির মধ্য দিয়া জগৎকে বিলাইতে হইবে। যাহারা ঘুমাইয়া আছে, হুহুঙ্কার গর্জ্জনে তাহাদিগকে জাগাইতে হইবে, যাহারা কর্ত্তব্য ভুলিয়া আছে, তাহাদিগকে বিবেক-চেতনায় উজ্জীবিত করিতে হইবে; যাহারা শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ রহিয়াছে, তাহাদিগকে নবজীবনের পূর্ণাভিষেক দিতে হইবে; অন্ধ-তিমিরে যাহারা আবৃত রহিয়াছে, দিব্য-দৃষ্টির অঞ্জনে তাহাদিগকে চক্ষুষ্মান্ করিতে হইবে। নাম-সাধনে সিদ্ধ হইয়া আজ তুমি অব্যর্থ-সঙ্কল্প হও; সঙ্কল্পের বলে, বিশুদ্ধা ইচ্ছার শক্তিতে তোমাকে অসামঞ্জস্যের গিরিমালা ঝড়ের মুখে তৃণ-গুচ্ছের মত উড়াইয়া দিতে হইবে, বিধি-বিপর্য্যয়ের সমুদ্র-তরঙ্গ মরুভূমির বালুকা-পুঞ্জের ন্যায় শুষ্ক ও নীরস করিয়া দিতে হইবে।

সঙ্কল্প করিয়া যদি তৃণ-মুষ্টি ধর,
বজ্রে তাহা হবে পরিণত,—
শত শতাব্দীর সাথী অমঙ্গলরাশি
মুহূর্ত্তেকে করিবে নিহত।

ভাল আছি। কুশল দিও। ★ ★ ★ ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি ওঁ কলিকাতা

২৫শে ভাদ্র, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়াসু–,

স্নেহের মা, ★★★ তোমার মধ্যে শ্রীভগবান্ যেদিন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, সেদিন তোমার সামান্য স্নেহদৃষ্টির শক্তিতে সহস্র সহস্র সন্তান জীবন-গঠন করিয়া কৃতার্থ হইবে। সকল ছেলেরা তোমাকে মা বলিয়া ডাকে, এ সংবাদে বড়ই আনন্দিত হইলাম। মা বলিয়া ডাকিয়া, মা বলিয়া জানিয়া, মা বলিয়া অনুভব করিয়া ভারতবর্ষের নবযুবকেরা তাহাদের লুপ্ত মনুষ্যত্বের উদ্ধার সাধন করিবে। কিন্তু তোমাদিগকেও মা এমন মাতৃময়ী শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে যেন, এ সব সন্তানেরা শুধু তোমাদের আশীর্ব্বাদের এক কণা পাইয়াই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে, ভগবানের কাজে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে।

এই মাতৃময়ী মহাশক্তি অর্জ্জনের মূলসূত্র হইল একনিষ্ঠ ভগবৎ সাধন। সাধন তোমাকে প্রকৃত মা করিয়া গড়িয়া তুলিবে, সাধন তোমাকে সন্তানের অভয়দাত্রী এবং সন্তানের বিপদ-বারিণী করিবে।

অনেকে মা হইতে চাহে, পরের ছেলেকে নিজের ছেলে বলিয়া ভাবিতে চাহে, কিন্তু সাধন করে না। তাহারা ঠকে। প্রকৃত মা তাহারা হইতে পারে না, মায়ের স্বরূপ তাহারা পায় না। মাতৃত্বের একটা বাহ্য অভিনয় মাত্র তাহারা করিয়া যায়।

তোমার প্রতি তাই মা আমার একমাত্র উপদেশ এই যে, প্রাণ-মনে মা সাধন-নিরতা হও, ভগবৎ-সাধনকে জীবনের সার-সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ কর। নাম তোমাকে প্রেম দিবে। সেই প্রেমের দৃষ্টি জগতের যেখানে যখন ফেলিবে, তখনই সে স্থান পুণ্যময় হইবে। সে দৃষ্টি যে পুরুষের উপর পড়িবে, সে-ই তখন অনির্ব্বচনীয় সন্তান-ভাবের দ্বারা আপ্লুত হইবে, মা-ছাড়া তার মুখে আর অন্য কথা থাকিবে না, মা-ছাড়া তার চ'খে আর অন্য দৃশ্য প্রতিভাত হইবে না। ★★★ ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ কলিকাতা

২৭শে ভাদ্র, ১৩৩৬

পরমকল্যাণীয়াসু–,

স্নেহের মা, ★★★ যে সকল কুমারী কন্যা আজ কৈশোরের গণ্ডীতে গিয়া পদক্ষেপ করিতেছে, তাহাদিগকে কোন্ বার্ত্তা শুনাইবে বল দেখি? তাহাদিগকে শুনাইতে হইবে যে, জাতির তাহারা ভবিষ্যৎ, দেশের তাহারা মহাশক্তি। তাহাদিগকে শুনাইতে হইবে যে, পশুবলের ধ্বংস সাধন করিতে, রিপুকুল বিনাশ করিতে, অমঙ্গলের শিরচ্ছেদন করিতে তাহাদের জন্ম, অশক্তকে শক্তিমান, ভীরুকে নির্ভীক, পতিতকে অভ্যুত্থিত করিতে তাহাদের আবির্ভাব। কামুক নরপশুর কবলে পড়িয়া, ঘৃণিত কুক্কুরের ষড়যন্ত্রে অভিভূত হইয়া অবলা সতী-সাধ্বী আজ কি হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদে, কি মর্ম্মস্পর্শী কাতর ক্রন্দনে বাংলার আকাশ-বাতাসকে মথিত করিতেছে, তাহা আজ ইহাদিগকে শুনাইতে হইবে। লজ্জাবতী লতা সাজিয়াই যে নারী তার মনুষ্যত্বকে অবমানিত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে, দৃঢ়তা, সাহস, শারীরিক বল, অকুতোভয়তা যে আজ তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে, এই সব কথা শুনাইতে হইবে। শুনাইতে হইবে যে, বিবাহকেই নারী-জীবনের সর্ব্বজনীন লক্ষ্য বলিয়া মনে করিলে চলিবে না, সংসারী-জীবনকেই সুখ-সম্পদের একমাত্র মধু-চক্র ভাবিলে চলিবে না, যাহার যোগ্যতা আছে, তাহাকে চিরপবিত্র কৌমার্য্যের ব্রতও গ্রহণ করিতে হইবে এবং চিরব্রহ্মচর্য্যের শক্ত ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া দেশ ও সমাজের জন্য হৃৎপিণ্ডের রক্ত অঞ্জলি দিতে হইবে। সর্ব্বশেষে শুনাইতে হইবে যে, সৎ-সঙ্কল্পের সাধনে সহস্রবার হয়ত সমাজ-পতিদের শাসনের নির্ব্বিচার গুরুদণ্ড আসিয়া পড়িবে, সহস্রবার হয়ত নীচমনা পুরুষদের মিথ্যা কদর্য্য অপবাদ জীবনকে ভারগ্রস্ত করিতে চাহিবে, কিন্তু ভয় পাইলে চলিবে না, থামিয়া পড়িলে চলিবে না, বীরের মত নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হইতে হইবে।

★ ★ ★ ★ ★

এমন একটা সময় দেশের আসিতেছে, যখন দেশের মেয়েরা সমগ্র

ভারতের চিরস্থায়ী উন্নতি বিধানের জন্য আত্মোৎসর্গে অগ্রসর হইবেন। সময়টা এখনও আসিয়া পড়ে নাই, আসিতেছে। সেই দিন দলে দলে মায়েরা আসিবেন, কোনও বাধা মানিবেন না, কোনও নিন্দাতে কর্ণপাত করিবেন না, কোনও কঠিন কার্য্যকে অসম্ভব মনে করিবেন না।– আজ যাঁহারা নিজেদের উৎসর্গ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা সেই ভাবী তপস্বিনী-মণ্ডলীর অগ্রদূত মাত্র। ★ ★ ★ ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি ওঁ

কলিকাতা
৩০শে ভাদ্র, ১৩৩৬

স্নেহের মা,–

তোমরা আজ প্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্য তৈরী হও।

নারী ভগবতীর অংশ-সম্ভূতা হইয়াও আজ কাম-কুক্কুরের পদতলে সতীধর্ম্মকে লুটাইয়া দিতেছে। নারী ত্যাগ-বৈরাগ্যের ধাত্রী হইয়াও আজ বিলাসিতার মোহে, লালসার লেলিহান অগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিতেছে। যে নারী রণচণ্ডিকার মূর্ত্তি ধরিয়া মহিষাসুর মর্দ্দন করিত, সে আজ ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিতে চাহে, আর অপরদিকে যম-লজ্জার এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া পাপিষ্ঠেরা তাহাদের কলুষিত স্পর্শের জঘন্য কালিমা নারীর সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া দিয়া যায়।

এই দুর্গতি ঘুচাইবার দায়িত্ব মা তোমাদের উপর, তোমার ন্যায় চিরকুমারীদের উপর এবং কুমারীর ন্যায় পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্তা মা-দের উপর। তোমাদিগকে আজ মৃত্যুভয় ভুলিতে হইবে। অহর্নিশ জপ করিতে হইবে,–'মৃত্যু নাই, আমরা অমর'। আত্মরক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য, সতীত্ব রক্ষার জন্য, তোমাদিগকে করযুগে শাণিত কৃপাণ ধারণ করিতে হইবে, উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রত্যেক অবলার দুর্ব্বল বাহুতে শক্তির সঞ্চারণা ঘটাইতে হইবে।

তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্র কি সহরেই হইবে? আমি তাহা মনে করি না।

বাহুতে বল লইয়া, বুকে সাহস লইয়া, হৃদয়ে উৎসাহ লাইয়া প্রাণে ভগবৎ-প্রীতি লইয়া তোমাদিগকে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে, গ্রামের অশিক্ষিতা মেয়েদিগকে সুশিক্ষিতা এবং শক্তি-সাধনায় উদ্বুদ্ধা করিতে হইবে, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ ভুলিয়া জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বালিকাকে আত্মোৎসর্গের মহাযজ্ঞে আহুতি হইবার জন্য প্রেরণা যোগাইতে হইবে। কি ভাবে প্রলোভন দমন করিতে হয়, কি ভাবে লম্পট পশুর দন্ত-পংক্তি পাদুকা-প্রহারে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, কি ভাবে অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হয়, যেখানে দেহের বলে নিজের মান রক্ষা সম্ভব নহে, কি ভাবে সেখানে আত্মার শক্তিতে নির্ভর করিয়া তিল তিল করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে হয়, তাহা শিখাইবার অধিকার তোমাদের। পুরুষের শক্তি যেখানে অক্ষম বা উদাসীন, দুর্ব্বলা নারীকেও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সেখানে কি করিয়া অসত্যের প্রতিবাদ করিতে হয়, অন্যায়ের প্রতিকার করিতে হয়, তাহা শিখাইবার ভার মা তোমাদের উপর। আমরা যাহারা নিজের ভগ্নী, নিজের কন্যা, নিজের কুললক্ষ্মীদের মান অব্যাহত রাখিতে পারিলাম না, শকুনিতে যে ভাবে মরা গরুর মাংস খায়, তেমনি করিয়া লম্পট পশুরা আসিয়া আমাদের সহোদরার, আমাদের দুহিতার, আমাদের কুলবধূর নাড়ীভুঁড়ি আমাদের চক্ষের সম্মুখে বসিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া খাইল, নারীত্বের অবমাননা করিল, সতীধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিল, আর আমরা নির্ব্বিবাদে, নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিকার চিত্তে এই ধর্ষণ দেখিয়াও অগ্রাহ্য করিলাম, ইহার পরিণাম বুঝিয়াও চুপ করিয়া রহিলাম, বজ্রহুঙ্কারে ধরিত্রী কাঁপাইয়া খড়গহস্তে অপমানকারীর উদ্ধত মুণ্ড ছিন্ন করিয়া আনিলাম না, রক্তের প্রবাহে কুলের কলঙ্ক ধুইয়া দিতে পারিলাম না, ক্ষোভে, ক্রোধে পৃথিবীটাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারিলাম না, এমন কি একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত আমাদের মুখ দিয়া বহির্গত হইল না,–তাহাদের উপর তোমাদের নির্ভর করিলে চলিবে না। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি ওঁ
কলিকাতা
৩রা আশ্বিন, ১৩৩৬

স্নেহের মা,–

★ ★ ★ আত্মীয়-স্বজনের জন্য যে মায়িক ব্যাকুলতা প্রত্যেকের পক্ষে স্বাভাবিক, দেশকর্ম্মিণীদিগকে তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। নতুবা আত্মোৎসর্গ সম্ভব হইবে না। সংসারে থাকিয়া সাংসারিক কার্য্যে শৈথিল্য করিলে চলিবে না কিন্তু সংসারের কোনও বস্তু বা ব্যক্তির উপরে আমার-আমার ছাপ লাগাইলেও চলিবে না। দৃষ্টি থাকিবে শ্রীভগবানে, লক্ষ্য থাকিবে শ্রীভগবানে। মনে জাগিবেন শ্রীভগবান্, প্রাণে জাগিবেন শ্রীভগবান্, সম্মুখে থাকিবেন শ্রীভগবান্, পশ্চাতে থাকিবেন শ্রীভগবান্, অতীতে থাকিবেন শ্রীভগবান্, ভবিষ্যতে থাকিবেন শ্রীভগবান্। শ্রীভগবানকে জীবনের সার জানিয়া তাঁহারাই নির্দ্দেশে দেশের জন্য, দশের জন্য অকাতরে প্রাণদান করিতে হইবে।

★ ★ ★ শক্তির বিকাশ হইবে কোন্ পথে ? আত্মোৎসর্গের পথে। প্রাণদানে প্রস্তুত হও, তবেই প্রাণবন্ত হইবে। পরার্থের যজ্ঞানলে জীবনাহুতি দিতে প্রস্তুত হও, নবজীবনের অমৃত-রসায়নে তবেই মা সঞ্জীবিত হইবে। মৃত্যুকে ভয় করিয়া চিরকালই লোকে শুধু– মরিয়াছে, অমর ত' হয় নাই! অমর হইবার একটী মাত্র পথ আছে,–তাহা হইতেছে অবলীলাক্রমে মৃত্যুকে বরণ করা, মৃত্যুর ভীষণতার ভ্রূকুটি-ভঙ্গীকে উপেক্ষা করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। নিজেকে তুমি গঠন কর, –বজ্রাঘাত সহিতেও যেন হৃৎকম্প না আসে, কণ্ঠনালী ছিঁড়িয়া দিতেও যেন কুণ্ঠা না আসে। ভগবানের কাজে সমগ্র জীবন কঠোর কষ্ট, কঠোর নির্য্যাতন, অসহনীয় লোকনিন্দা সহ্য করিতে হইলেও যেন শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে তিলমাত্র চ্যুত হইয়া থাকিবার প্রলোভন না আসে। এমন দৃঢ়তা থাকিবে, তবে ত' তাঁর কৃপার অধিকারিণী হইবে! ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৬

স্নেহের মা,

★ ★ ★ যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে পায়। যে যাহার জন্য প্রাণ-মন সমর্পণ করে, সে তার আপনার আপন হইয়া, জীবনের জীবন হইয়া, বুক জুড়ান ধন হইয়া, প্রাণের মাণিক হইয়া প্রাণারাম সাজে আবির্ভূত হয়। যার জন্য সে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করে, তার জন্য সে-ও পাগল হইয়া ছুটিয়া আসে। তুমি যদি শ্রীপ্রভুকে ভালবাস মা, কেন তুমি তাঁহাকে পাইবে না? তোমার সকল দোষ, সকল ত্রুটি, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া কেন তিনি তোমাকে তাঁহার স্নেহের ক্রোড়ে টানিয়া তুলিবেন না ? কেন তিনি তোমার আদরের নিধি হইয়া, সোহাগের ধন হইয়া, সুধার সাগর হইয়া তোমার দেহমনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিবেন না ? কেন তিনি তোমাকে নয়নের আনন্দরূপে অভিনন্দিত করিবেন না ? কেন তিনি তোমাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া স্নেহ-শীতল উদার বুকের প্রেমময় স্পর্শ দান করিবেন না ? তিনি যে সর্ব্বাবস্থাতেই তোমার!

তুমি চিরদুঃখিনী। কিন্তু দুঃখই যে মা তাঁহাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ পথ। শ্রীপ্রভুকে যে চায়, দুঃখ যে তার নিত্যসঙ্গী মা! শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে যে আশ্রয় পাইতে চায়, দুঃখের গহন বনের কণ্টকময় পথই যে তাহাকে নগ্ন চরণে অতিক্রম করিতে হইবে। তাঁর ক্রোড়ে উঠিয়া যে বসিতে চায়, তাকে যে মা আগে যুগের পর যুগ শিরোপরি বজ্রবহ্নি বহন করিতে হয়। শ্রীপ্রভুকে যে মন-প্রাণ সঁপে, তাকে যে মা সহস্র চিতার জ্বলন্ত চুল্লীর উপরে তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইয়া খাঁটি হইতে হয়।

শ্রীপ্রভুকে কি ভালবাসিয়াছ ? তবে, জানিও, এই ভালবাসার মান রাখিবার জন্য তোমাকে উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল অকূল সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিতে হইবে,–হাঙ্গর কুম্ভীরের ভয় করিলে চলিবে না। শ্রীপ্রভুর প্রতি তোমার যে ভালবাসা, তাহার গভীরতা প্রমাণ করিবার জন্য অম্লান-বদনে অকাতরে

(৩৭)

হরি ওঁ
কলিকাতা
৩রা আশ্বিন, ১৩৩৬

স্নেহের মা,–

★★★ আত্মীয়-স্বজনের জন্য যে মায়িক ব্যাকুলতা প্রত্যেকের পক্ষে স্বাভাবিক, দেশকর্ম্মিণীদিগকে তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। নতুবা আত্মোৎসর্গ সম্ভব হইবে না। সংসারে থাকিয়া সাংসারিক কার্য্যে শৈথিল্য করিলে চলিবে না কিন্তু সংসারের কোনও বস্তু বা ব্যক্তির উপরে আমার-আমার ছাপ লাগাইলেও চলিবে না। দৃষ্টি থাকিবে শ্রীভগবানে, লক্ষ্য থাকিবে শ্রীভগবানে। মনে জাগিবেন শ্রীভগবান্, প্রাণে জাগিবেন শ্রীভগবান্, সম্মুখে থাকিবেন শ্রীভগবান্, পশ্চাতে থাকিবেন শ্রীভগবান্, অতীতে থাকিবেন শ্রীভগবান্, ভবিষ্যতে থাকিবেন শ্রীভগবান্। শ্রীভগবানকে জীবনের সার জানিয়া তাঁহারাই নির্দ্দেশে দেশের জন্য, দশের জন্য অকাতরে প্রাণদান করিতে হইবে।

★★★ শক্তির বিকাশ হইবে কোন্ পথে ? আত্মোৎসর্গের পথে। প্রাণদানে প্রস্তুত হও, তবেই প্রাণবন্ত হইবে। পরার্থের যজ্ঞানলে জীবনাহুতি দিতে প্রস্তুত হও, নবজীবনের অমৃত-রসায়নে তবেই মা সঞ্জীবিত হইবে। মৃত্যুকে ভয় করিয়া চিরকালই লোকে শুধু– মরিয়াছে, অমর ত' হয় নাই! অমর হইবার একটী মাত্র পথ আছে,–তাহা হইতেছে অবলীলাক্রমে মৃত্যুকে বরণ করা, মৃত্যুর ভীষণতার ভ্রূকুটি-ভঙ্গীকে উপেক্ষা করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। নিজেকে তুমি গঠন কর, –বজ্রাঘাত সহিতেও যেন হৃৎকম্প না আসে, কণ্ঠনালী ছিঁড়িয়া দিতেও যেন কুণ্ঠা না আসে। ভগবানের কাজে সমগ্র জীবন কঠোর কষ্ট, কঠোর নির্য্যাতন, অসহনীয় লোকনিন্দা সহ্য করিতে হইলেও যেন শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে তিলমাত্র চ্যুত হইয়া থাকিবার প্রলোভন না আসে। এমন দৃঢ়তা থাকিবে, তবে ত' তাঁর কৃপার অধিকারিণী হইবে! ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৬

স্নেহের মা,

★★★ যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে পায়। যে যাহার জন্য প্রাণ-মন সমর্পণ করে, সে তার আপনার আপন হইয়া, জীবনের জীবন হইয়া, বুক জুড়ান ধন হইয়া, প্রাণের মাণিক হইয়া প্রাণারাম সাজে আবির্ভূত হয়। যার জন্য সে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করে, তার জন্য সে-ও পাগল হইয়া ছুটিয়া আসে। তুমি যদি শ্রীপ্রভুকে ভালবাস মা, কেন তুমি তাঁহাকে পাইবে না? তোমার সকল দোষ, সকল ত্রুটি, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া কেন তিনি তোমাকে তাঁহার স্নেহের ক্রোড়ে টানিয়া তুলিবেন না ? কেন তিনি তোমার আদরের নিধি হইয়া, সোহাগের ধন হইয়া, সুধার সাগর হইয়া তোমার দেহমনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিবেন না ? কেন তিনি তোমাকে নয়নের আনন্দরূপে অভিনন্দিত করিবেন না ? কেন তিনি তোমাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া স্নেহ-শীতল উদার বুকের প্রেমময় স্পর্শ দান করিবেন না ? তিনি যে সর্ব্বাবস্থাতেই তোমার!

তুমি চিরদুঃখিনী। কিন্তু দুঃখই যে মা তাঁহাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ পথ। শ্রীপ্রভুকে যে চায়, দুঃখ যে তার নিত্যসঙ্গী মা! শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে যে আশ্রয় পাইতে চায়, দুঃখের গহন বনের কন্টকময় পথই যে তাহাকে নগ্ন চরণে অতিক্রম করিতে হইবে। তাঁর ক্রোড়ে উঠিয়া যে বসিতে চায়, তাকে যে মা আগে যুগের পর যুগ শিরোপরি বজ্রবহ্নি বহন করিতে হয়। শ্রীপ্রভুকে যে মন-প্রাণ সঁপে, তাকে যে মা সহস্র চিতার জ্বলন্ত চুল্লীর উপরে তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইয়া খাঁটি হইতে হয়।

শ্রীপ্রভুকে কি ভালবাসিয়াছ ? তবে, জানিও, এই ভালবাসার মান রাখিবার জন্য তোমাকে উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল অকূল সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিতে হইবে,–হাঙ্গর কুম্ভীরের ভয় করিলে চলিবে না। শ্রীপ্রভুর প্রতি তোমার যে ভালবাসা, তাহার গভীরতা প্রমাণ করিবার জন্য অম্লান-বদনে অকাতরে

হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া তোমাকে রক্তের অঞ্জলি তাঁর ঐ রাঙ্গা পায়ে ঢালিতে হইবে, নিজের মুণ্ড নিজে কাটিয়া ঘণ্ট রাঁধিয়া তাঁর পূজার নৈবেদ্য সাজাইতে হইবে। শ্রীপ্রভুর কোটি কোটি সন্তান-সন্ততি আজ যে দুঃখ-দুর্গতির কুম্ভীপাকে পড়িয়া করুণ আর্ত্তনাদে গগন পবন মথিত করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আজ তোমার ন্যায় দুঃখিনীকেই "জয়প্রভু" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া আত্মবলি দিতে হইবে।

চিরদুঃখক্লিষ্টা মা আমার, দুঃখিনী বলিয়া নিজেকে অযোগ্যা ভাবিও না। দুঃখিনীরাই জগতের দুঃখ দূর করে, সুখালস-তন্দ্রিতা ভোগ-বিলাসিনীরা নহে। যত মানসিক কষ্ট বা শারীরিক ক্লেশ এতকাল অবস্থার ফেরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া সহিয়া আসিয়াছ, আজ হইতে তাহার সহস্রগুণ ক্লেশ স্বেচ্ছায় মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হও। ডাকিয়া বল,–"এস ঝড়ঝঞ্ঝাট, তোমাকে আমি পরাভূত করিব।" ডাকিয়া বল, "এস দুর্য্যোগ, তোমাকে আমি ব্যর্থ করিব।" ডাকিয়া বল, - "এস অমানিশা, তোমার নিবিড় তমসার জাল আমি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিব।" চিরদুঃখিনী মা আমার, দুঃখ তোমার গর্ব্ব হউক, তোমার গৌরবের বস্তু হউক।

যেখানে বসিয়া আজ তুমি কর্ম্ম-জীবনের প্রথম পাঠ আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছ, সেই স্থানই কি তোমার চিরকালের কর্ম্মক্ষেত্র থাকিয়া যাইবে? বিদ্যালয়-প্রাচীরের আবেষ্টনের মধ্যেই কি তোমাদের দুঃখবরণ-যজ্ঞের শেষ আহুতি হইবে ? গ্রামে গ্রামে কুটীরে কুটীরে কি তোমরা শ্রীপ্রভুর বজ্রবাণী বহন করিয়া লইয়া যাইবে না ? প্রতি পল্লীর প্রত্যেক নারীর নিদ্রিত চেতনাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য কি তোমরা ভোরের পাখীর মধুর জাগরণী গাহিয়া গাহিয়া আসমুদ্র হিমাচলের প্রত্যেক ধূলিকণায় তোমাদের চরণের স্পর্শ অনুভব করাইবে না ? অবগুণ্ঠনের অভ্যন্তরেই কি তোমাদের সবখানি তেজ, সবখানি সাহস, সবখানি শক্তি লুকাইয়া রাখিবে ?

আমি বলি, নিশ্চয়ই না। শ্রীপ্রভুই যদি তোমার ধ্যান, জ্ঞান, জপ, তপ হইয়া থাকেন, তবে জানিও শ্রীপ্রভুর সন্তান-সন্ততির কল্যাণের জন্যই তোমার দেহ আত্মার ভার গ্রহণ করিবে, শ্রীপ্রভুর কাজই তোমার জীবনের

একমাত্র কাজ হইবে। ★ ★ ★ শ্রীপ্রভু তোমার মঙ্গল করুন। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৯)

ওঁ ব্রহ্মগুরু কলিকাতা

২৪শে আশ্বিন, ১৩৩৬

স্নেহের মা,

আজ মহামায়ার মহাপূজার প্রথম দিন। আজ কিন্তু সহস্রবার শুধু তোর কথাই মনে পড়িতেছে। যতবার মা তোর কথা মনে পড়িতেছে, ততবারই প্রাণ শুধু আকুল হইয়া ভাবিতেছে, কবে তুই মা-দুর্গার মত মহিষমর্দ্দিনী হইয়া বাহির হইয়া আসিবি, কবে আসিয়া তুই রিপুকুল নিবারণ করিবি, দুঃখার্ত্ত জগতের দুর্গতি নাশ করিবি, দুঃখভার হরণ করিবি ? আজ আমি যেন বারংবার ভুলিয়া যাইতেছি যে, তুই শিক্ষার্থীনী, তুই বিদ্যার্থীনি, তোকে এখনও অনেকদিন জ্ঞান-মন্দিরে স্থিরাসনে বসিয়া বিদ্যার চর্চ্চা করিতে হইবে। আজ আমার প্রাণমন একান্ত অধীর হইয়া যেন শুধু এই প্রার্থনাই করিতেছে, –আয় মা আজ আমার চির-জীবনের সাধ পূরাইয়া ধ্যান-লোকের সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের সকল অসত্য ধ্বংস করিতে।

★ ★ ★ ★ ★

তোমার সকল সাধনার মূল ভিত্তির প্রতিষ্ঠা ভগবানকে পাওয়াতে। সমগ্র জীবন জগতের প্রত্যেক কার্য্যে তোমাকে নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। তোমার এই বৈশিষ্ট্যের মূল শ্রীভগবান্। গৃহে ও বাহিরে স্বদেশ ও বিদেশে সর্ব্বত্র তোমাকে এক আশ্চর্য্য ও অভিনব জীবন যাপন করিতে হইবে। তোমার এই আশ্চর্য্যজনকতা ও অভিনবত্ব সব নির্ভর করিবে ভগবানকে পাওয়ার মধ্যে।

"সকল ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীপ্রভুকে চাই।" –এই কথার সত্যটুকু কি মা ? প্রকৃত সত্যটুকু এই যে, শ্রীভগবানকে পাইলে জগতের সব কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া মানে কি ? তাঁহাকে পাওয়ার মানে নিজেকে একান্তই তাঁহার বলিয়া জানা, তাঁহাকে পাওয়ার মানে নিজের

দেহ, মন, আত্মার উপরে, নিজের যথা-সর্ব্বস্বের উপরে তাঁরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, তাঁহাকে পাওয়ার মানে বুকের মাঝখানটায় তাঁহার স্বর্ণময় সিংহাসন স্থাপন করিয়া প্রাণমনের কুসুমরাজি অঞ্জলি ভরিয়া তাঁহারই চরণে সমর্পণ করা, তাঁহাকে পাওয়ার মানে তাঁহাকে সব কিছু দেওয়া। তাঁহাকে যতখানি দিয়া ফেলিতে পারিলে, তাঁকে মা ততখানি পাইলে। তাঁহাকে কি তুমি তোমার ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু, স্বজন সব দিতে পারিয়াছ? জানিও, তাহা হইলে ভ্রাতা-রূপে, ভগ্নীরূপে, বন্ধুরূপে, স্বজন-রূপে মা তাঁহাকেই পাইয়াছ। তাঁহাকে তুমি কি তোমার পিতা, মাতা, আত্মীয়, বান্ধব সব কিছু দিতে পারিয়াছ? যদি পারিয়া থাক, তবে জানিও মা, পিতারূপে তাঁহাকে পাইয়াছ, মাতারূপে তাঁহাকে পাইয়াছ, আত্মীয়রূপে তাঁহাকে পাইয়াছ, বান্ধবরূপে তাহাকে পাইয়াছ। তাঁহাকে তুমি তোমার স্বামী, পুত্র, কন্যা সব কিছু কি দিতে পারিয়াছ? যদি দিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহাকেই তুমি স্বামীরূপে পাইয়াছ, পুত্ররূপে পাইয়াছ, কন্যারূপে পাইয়াছ। তাঁর জন্য যে যাহা বলি দেয়, সে তাহার সহস্রগুণ ফিরিয়া পায়, তাঁর জন্য একটী সন্তান বলি দিয়া জগদ্ব্যাপিয়া সহস্রকোটি সন্তান পায়, একটী কন্যার পরিবর্ত্তে অসংখ্য কন্যা আর একটী পুত্রের বিনিময়ে অসংখ্য পুত্র লাভ করে। তাঁকে পাওয়ার মানে তাঁর জন্য বিনা সর্ত্তে সব দেওয়া এবং সহস্রগুণ পাওয়ার মানে তাঁর প্রতি অফুরন্ত দিব্য প্রেম লাভ করা।

শ্রীপ্রভুকে চাওয়া বড় কঠিন চাওয়া। তাই মা লোকে পারত পক্ষে তাঁহাকে চাহে না, সময় থাকিতে চাহে না। চাহে অসময়ে, বিপদে ঠেকিয়া, দুঃখের পীড়ন অসহন জানিয়া, দায়ে পড়িয়া। শ্রীভগবানের পায়ে লোকে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে যায় শুধু উপায়ান্তর না দেখিয়া।

তাঁকে চাওয়া বড় কঠিন চাওয়া। কারণ তাঁকে পাওয়া যে মা অনেক পাওয়া! তাঁকে পাওয়ার মানে যে তাঁর প্রতি অখণ্ড-বিশ্বাসকে পাওয়া, তাঁর প্রতি নির্ভরকে পাওয়া, হাতুড়ীর ঘায়ে বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও তাঁহাকে দয়ার-সাগর বলিয়া জানা।

তাঁকে পাওয়ার মানে, বিনিময়ে তাঁর কাছে কিছু না চাওয়া। সব

তাঁকে দিব, কিছুই চাহিব না, ইহাই যে মা তাঁহাকে পাওয়া। বিনা সর্ত্তে, বিনা চুক্তিতে, একেবারেই বিনিময়বুদ্ধিহীন হইয়া নিজের যা কিছু সম্পদ, তাঁর পদতলে লুটাইয়া দেওয়াই যে মা তাঁকে পাওয়া।

শ্রীপ্রভুকে যদি পাইতে চাহ, তবে মা এই রকম পাওয়াই পাইতে হইবে। তাঁহাকে পাইতে গিয়া ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িতে হয় ছাড়িবে,—এমন মনের বল চাই। তাঁকে ভালবাসিতে গিয়া, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামীপুত্র সবকিছু পরিত্যাগ করিতে হয়, তাও করিবে,—এমন সঙ্কল্পের শক্তি চাই। তাঁর জন্য দুঃখ-বরণ করিলে তিনি যদি সে দুঃখের গভীরতা না বুঝেন, তাঁর জন্য ব্যথা পাইলে তিনি যদি আসিয়া আহত স্থানে হাত বুলাইয়া নাও দেন, তাঁর জন্য চোখের জল ফেলিলে তিনি যদি স্নেহের আঁচল দিয়া অশ্রুধারা না মুছাইয়া দেন, তবু প্রাণ দিয়া তাঁকেই ভালবাসিব,— এই রকমের নিষ্ঠা চাই। চতুর্দ্দিকে সহস্র প্রলোভন যদি ভালবাসার জাল বিস্তার করে, তবু আমি প্রভুর পাদপদ্ম হইতে টলিব না, তাঁর পদরজ ছাড়িব না, তাঁর পায়ে যে প্রাণ একবার সমর্পণ করিয়াছি, সেই প্রাণ আর ফিরাইয়া আনিব না, দেওয়া প্রাণ আর ফিরাইয়া চাহিব না, তিনি যদি উপেক্ষা করেন, তবু তাঁর প্রেম-সুন্দর আলেখ্যই ধ্যান করিয়া জন্ম কাটাইয়া দিব, তিনি যদি অবজ্ঞা করেন, তবু তাঁকেই প্রাণনাথ বলিয়া অর্চ্চনা করিব, তিনি যদি অবহেলা করেন, তবু তাঁহাকে হৃদয়ের রাজ-অধিরাজ বলিয়া আরতি করিব, —এই দৃঢ়তা থাকা চাই। তিনি যদি লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিতে চাহেন, তবু তাঁহাকেই হৃদয়স্বামী বলিয়া জানিব, প্রাণনাথ বলিয়া মানিব, সর্ব্বেশ্বর বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যাইব,—এমন সবলতা চাই।

* * * * *

স্বয়ং শ্রীভগবান ছাড়া যে আপন কেহ নাই, একথা মা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু কখন মানুষ একথা বলিবার অধিকারী হয়? যখন তাঁর ক্ষুদ্র একটী আদেশ পালনের জন্য, তুচ্ছ একটী ইঙ্গিতের মানরক্ষার জন্য জগতের সবকিছু প্রিয়বস্তু নিজহাতে বলি দিতে পারে। আজ হইতে মা দিবারাত্রি শুধু এই এক মন্ত্র জপিতে থাক,—"হে প্রভো, হে প্রাণপ্রিয়, তোমার জন্য

আমি সর্ব্বস্ব বলি দিব,–একবার শুধু আমার হও।” মনে প্রাণে এই একটীমাত্র কথা সহস্রবার উচ্চারণ কর, সহস্রবার জপ কর, আর শ্রীভগবানের পবিত্রতাসুন্দর মাধুর্য্যময়ী মহামূর্ত্তি চখের জলে বুক ভাসাইয়া ধ্যান কর। বারংবার সেই পরমপ্রেমময় শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে নিবেদন কর, আর বল,– “হে প্রভো, নাথ, জীবনদেবতা, হৃদয়-সর্ব্বস্ব, আমি তোমার, আমি তোমার, আমি তোমার।”

এই অনুপ্রেরণায় মা পাগলিনী হও, উন্মাদিনী হও, হৃদয়-মন-মথিত কর, অস্থিরা হও, অধীরা হও, ব্যাকুলা হও, বিহ্বলা হও। তবে ত' তিনি আপন হইবেন!

কিন্তু তাঁর ভালবাসা বড় বিষম ভালবাসা। এ ভালবাসা যার উপরে পড়ে, তার মাথায় বিনামেঘে বজ্রঘাত ঘটে, অকারণে তাহাকে লাঞ্ছনা সহিতে হয়, নিন্দা-নির্য্যাতন তার প্রাণের দোসর হয়, দুঃখ-দৈন্য দুর্দ্দশা তার অঙ্গের অলঙ্কার হয়। শ্রীপ্রভুর প্রেম সংসার, সমাজ, জাতি, কুল, মান, লোকলাজ সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। তাঁর সেই অপার্থিব প্রেমের জন্য তোমাকে মা এই সুদুর্লভ মূল্য দান করিতে হইবে। তাহারই জন্য প্রস্তুত হও। ইতি–

স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

“আসিবে সেদিন, আসিবে,
রমণী যেদিন দেবী-প্রতিভায়
যত মলিনতা নাশিবে।”
–শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ–